মহান কার্ল মার্কস স্মরণে

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

মহান কার্ল মার্কস স্মরণে — প্রভাস ঘোষ
(৭ মে ২০১৭-এর ভাষণ)

প্রথম প্রকাশ : ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১ মে ২০১৮

প্রকাশক : মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন : ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ :
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

মহান কার্ল মার্কস-এর ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ মে ২০১৭ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি সভা হয়। সভায় মহান মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য রূপে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে ভাষণ দেন, পরবর্তী সময়ে তাঁর নিজেরই করা কিছু সংযোজন সহ প্রথমে গণদাবী পত্রিকায়, পরে তার ইংরেজি অনুবাদ প্রোলেটারিয়ান এরায় প্রকাশ করা হয়। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সেটি প্রথম পুস্তক রূপে প্রকাশ করা হয়।

প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হল। এই মুদ্রণেও কমরেড প্রভাস ঘোষ কিছুটা পরিমার্জন করে দিয়েছেন।

১ মে ২০১৮ **মানিক মুখার্জী**

মহান কার্ল মার্কস স্মরণে

মানব ইতিহাসের এক অসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভাধর মনীষী, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এই একজন চিন্তানায়ক যাঁর চিন্তাকে ভিত্তি করে মানব ইতিহাসে যত আলোড়ন হয়েছিল, পূর্বে তা আর হয়নি। তাঁর চিন্তা একদিকে শোষক শ্রেণির চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, অন্যদিকে কোটি কোটি শোষিত মানুষের বুকে আশা-ভরসা জুগিয়েছে, মুক্তির পথ দেখিয়েছে। এই মহান চিন্তানায়কের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েই রাশিয়ায় মহান লেনিনের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, চিনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হয়েছিল, পূর্ব ইউরোপ মুক্ত হয়েছিল, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবায় বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজ ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল তাদেরও প্রেরণা ছিল এই মহান চিন্তানায়কের আদর্শ এবং শিক্ষা। সেই সময় পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা যে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল, তাঁদেরও প্রেরণার উৎস ছিলেন মহান কার্ল মার্কস। আবার এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনকেও পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল মহান মার্কসের চিন্তা। দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রামে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী বীরত্বের সাথে লড়েছেন, শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েই। এক বিশাল ও গভীর জ্ঞানভাণ্ডার মানবজাতির সামনে তিনি রেখে গেছেন, যা আজও সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। তাই স্বল্প সময়ে আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা খুব কঠিন। তবুও প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে আমি আলোচনা করতে চাই। মার্কসের মূল্যবান কিছু উক্তি আমি পড়েও শোনাতে চাই।

একটা প্রচলিত ধারণা হল, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দর্শন ততটা প্রাসঙ্গিক নয়— এ যেন অনেকটা আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর

নেওয়ার মতো। কিন্তু মার্কসবাদ দেখিয়েছে বাস্তবে তা নয়। প্রত্যেক মানুষই চিন্তাভাবনা করে এবং তার চিন্তাপ্রক্রিয়ায়, বিচারধারায়, সত্য-মিথ্যা ধারণায়, জীবনযাত্রায়, ন্যায়নীতিবোধ ও কর্তব্যবোধ নির্ধারণে কোনও না কোনও দর্শনের প্রভাব কাজ করে। অবশ্য এই প্রভাব অধিকাংশের ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে ঘটে, এ সম্পর্কে সচেতন অনেকেই নয়।

দর্শন মূলত দুই ভাগে বিভক্ত, ভাববাদী ও বস্তুবাদী। আমাদের দেশে একটা প্রচার আছে, প্রাচীনকালে এ দেশের চিন্তা বা দর্শন ছিল ভাববাদী, ভারতীয় দর্শনচিন্তায় আধ্যাত্মিকতাই ছিল প্রধান সুর। কিন্তু শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র মানব ইতিহাসের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, চূড়ান্ত বিচারে প্রকৃতি জগৎ বহির্ভূত অতিপ্রাকৃত শক্তি অথবা বস্তু বহির্ভূত সত্তার অস্তিত্বের যে ধারণা ভাববাদের মূল ভিত্তি, সেই ধারণা মানবসমাজে জন্ম নিয়েছিল সমাজবিকাশের একটি বিশেষ স্তরে যখন স্থায়ী সম্পত্তির আবির্ভাবকে ভিত্তি করে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে যায়। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে নানা আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, অন্য দেশের মতো এদেশেও মানব জাতির সূচনায় মানুষের চিন্তা প্রকৃতিজগৎভিত্তিক ছিল, বস্তুজগৎভিত্তিক ছিল। এখনও আদিম মানবের দেখা যেখানে পাওয়া যায়, যেখানে স্থায়ী সম্পত্তি ও মালিকানা ও শ্রেণি বিভাগ আসেনি সেই আন্দামানে, আফ্রিকার জঙ্গলে দেখবেন তাদের মধ্যে কোনও ঈশ্বরচিন্তা, অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা নেই। আগেও আমরা দেখিয়েছি যে, স্বয়ং বিবেকানন্দ বলেছেন, "প্রথম দিকে বাইরের প্রকৃতির মধ্যেই সত্য খোঁজা হয়েছিল, বস্তুজগতের মধ্যেই জীবনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল।"[১] এই ক্ষেত্রে তিনি সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে পড়ানো হয় চার্বাক দর্শন, লোকায়ত দর্শন— এইসব দর্শন বস্তুবাদী হিসাবে ইতিহাসে স্বীকৃত। প্রাচীনকালে কণাদ মুনি বলেছিলেন, ক্ষুদ্র কণা দিয়েই জগতের সবকিছু তৈরি হয়েছে। পঞ্চভূত বা পাঁচটা বস্তু —ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম থেকেই জগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে, যা আবার পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে। এইসব চিন্তাও এ দেশে ছিল। বস্তুবাদী চিন্তা অন্যান্য দেশেও ছিল, প্রাচীন গ্রিসেও ছিল। তাদের চিন্তার মধ্যেও বস্তুবাদের প্রভাব ছিল। প্রথমদিকে মানুষ এভাবেই চিন্তা করেছিল। শূন্যের আবিষ্কার ভারতেই হয়েছিল। শূন্যটাও নিছক শূন্য নয়। তারও একটা গাণিতিক মূল্য আছে। এইসব উন্নত চিন্তা অতীতে এই দেশে ছিল। 'দর্শন' বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত একটি শব্দ, যার মানে 'যা দেখি তাই সত্য'। ফলে দর্শন শব্দটাই তো বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ প্রমাণ করে।

মার্কস দেখান ধর্ম এসেছে নিপীড়িত মানুষের চোখের জল হিসাবে

ফলে আদিম সমাজে প্রকৃতি ও বস্তুজগতের বাইরে কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা মানুষের ছিল না। তাহলে ঈশ্বর বিশ্বাস বা ধর্মীয় চিন্তা কখন, কী উদ্দেশ্যে এল? মহান মার্কসই প্রথম দেখালেন, "ধর্ম হচ্ছে নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীতে হৃদয়, বিবেকহীন পরিস্থিতিতে বিবেক... আবার একই সাথে ধর্ম হচ্ছে মানুষের প্রকৃত দুঃখ-জ্বালার অভিব্যক্তি এবং প্রকৃত দুঃখ-জ্বালার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ।"[২] মার্কসের সহযোদ্ধা মহান এঙ্গেলস বলেছেন, "খ্রিস্টধর্ম এবং শ্রমিকদের সমাজতন্ত্র দাসত্ব ও দুর্দশার থেকে মুক্তির কথা বলে। ধর্ম মুক্তির কথা বলে মৃত্যুর পর স্বর্গে। আর সমাজতন্ত্র মুক্তির কথা বলে সমাজ পরিবর্তনের পথে।"[৩] তাঁদেরই সুযোগ্য ছাত্র মহান কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, "মানুষের মধ্যে এই ঈশ্বরচিন্তা এসেছে কেন? মানুষের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে এমন একটা সময়ে যখন সমাজ শ্রেণি বিভক্ত হয়েছে, মানুষ যখন স্থায়ী সম্পত্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, সমাজে যখন শাসক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। মানুষ যখন দেখেছে যে, যিনি শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন, তারই ইচ্ছায় যে আইন তৈরি হয়, সেই আইন সকলকে মেনে চলতে হয় এবং সেই কারণে সমাজও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়— এরকম একটা সময়ে এসে একটা চিন্তা মানুষের মগজে ধাক্কা দিয়েছে। মানুষ লক্ষ করেছে, এই যে বিশ্বচরাচর, এই যে দুনিয়া একটা নিয়মে চলছে, দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হচ্ছে। ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে— ...সমস্ত কিছু নিয়ম মেনে হচ্ছে। ... অর্থাৎ, সমাজের শৃঙ্খলার পেছনে শাসনকর্তার যে ভূমিকা বর্তমান, তাকে লক্ষ করে, প্রকৃতি ও বিশ্বচরাচরের নিয়ম, চলার কারণকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই দুটি ঘটনার মধ্যে যে সাদৃশ্য তাদের মনে ধাক্কা দিয়েছে তাকে ভিত্তি করেই তারা দুনিয়ার একজন প্রভু বা 'সুপার মাস্টার' আছে— এইভাবেই ভগবানকে খুঁজে পেয়েছে। ...খ্রিষ্টধর্ম দাসপ্রভুদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এবং সেই অর্থেই একসময় সমাজ প্রগতিতে সাহায্য করেছে। মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও এধরনের নজির পাওয়া যায়। ...আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সমাজ বিকাশের একটা স্তরে এসে ধর্মই মানুষের মধ্যে নীতিনৈতিকতার ধারণা, মূল্যবোধ, সেবার মনোবৃত্তি, অপরকে হেয় না করা, ন্যায় অন্যায়বোধের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এরই

ফলে সমাজে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠেছে এবং তা সমাজকে সংহত ও সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে এবং সেদিক থেকেও ধর্ম সমাজ প্রগতিতে সাহায্য করেছে।"[৪] সেই যুগে নিপীড়িত দাসদের মুক্তি কামনায় একদল বড় মানুষ এই 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর'-এর কাছে পথের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন, সাধনা করেছেন এবং তাঁদের মনে যেসব পথের উদয় হয়েছে, তাঁরা সততার সাথে মনে করেছেন সেসবই ঈশ্বরের বাণী। কারণ, সেই সময় বিজ্ঞানের এমন অগ্রগতি হয়নি যে যার থেকে জানা যায় মানুষের মস্তিষ্কের সাথে বস্তু ও বাস্তব জগতের দ্বন্দ্বের ফলেই মানুষের চিন্তার সৃষ্টি হয়। এই বাণী প্রচার করতে গিয়ে সেই যুগে তাঁরা দাসপ্রভুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন, কেউ কেউ প্রাণ দিয়েছেন। ফলে ঈশ্বরচিন্তার উৎপত্তি হয়েছে অত্যাচারিত দাসদের চোখের জল থেকেই। এ দিকটাই মার্কস, এঙ্গেলস, কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। আপনারা জানেন, পরবর্তীকালে সামন্ততন্ত্রের যুগে এই ধর্মই রাজা-বাদশা-সামন্তপ্রভুদের কাছে ধর্মীয় শাসন হিসাবে, অত্যাচারের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল। সেই আলোচনায় এখন আর যাচ্ছি না। শুধু বলতে চাই, একমাত্র মার্কসবাদী চিন্তানায়করাই শ্রদ্ধার সাথে ধর্মীয় চিন্তার ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকা দেখিয়েছেন, যেটা বুর্জোয়া চিন্তানায়করা দেখাননি। বরং বেকন, হব্‌স, লক, স্পিনোজা, হিউম, কান্ট প্রমুখ নবজাগরণের যুগে অশ্রদ্ধার সঙ্গেই ধর্মকে বলেছেন 'অ্যাবেরেশন অফ হিস্ট্রি', অর্থাৎ ইতিহাসের বিচ্যুতি। যদিও আজ ধর্মই বুর্জোয়াদের হাতে শেষ অবলম্বন হয়েছে শোষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

ভাববাদ বনাম বস্তুবাদের আদর্শগত লড়াই চলছেই

যখন থেকে ঈশ্বরচিন্তা এসেছে, ভাববাদী চিন্তা এসেছে, তখন থেকেই ভাববাদ আর বস্তুবাদের দর্শনগত লড়াই চলে আসছে। ভাববাদীদের একদল বলেন, অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ভগবানই এই প্রকৃতি জগৎ, বস্তু, প্রাণ ও মানুষ সবকিছুর স্রষ্টা, তার বিধানেই সব কিছু চলছে। অন্য এক দল বলেছেন, বস্তুবহির্ভূত একটা শক্তি ও বস্তুময় প্রকৃতি এই দ্বৈত শক্তি প্রথম থেকেই ক্রিয়া করে চলেছে। আরেক দলের অভিমত হল, ওই ঐশ্বরিক শক্তি বা শাশ্বত ভাবই একমাত্র সত্য, প্রকৃতি বা বস্তুজগৎ ওই শাশ্বত ভাবের প্রতিফলন মাত্র, এর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এঁরা সকলেই এক জায়গায় একমত যে, 'শাশ্বত ভাব' বা অতিপ্রাকৃত শক্তি বস্তুবহির্ভূত। অন্যদিকে বস্তুবাদীরা বস্তুকেই প্রাথমিক বলে গণ্য করেন, বাস্তবতার বাইরে অন্য কোনও

শক্তির অস্তিত্ব আছে মনে করেন না। মার্কসের ঘনিষ্ঠতম সহযোদ্ধা এঙ্গেলস বলেছেন, ''Those who asserted the primacy of spirit to nature and, therefore in the last instance, assumed world creation in some form or other... comprised the camp of idealism. The others who regarded nature as primary belong to the various school of materialism.''[৫] আমি আগেই বলেছি, অতীতকালে বিজ্ঞানের অত অগ্রগতি ঘটেনি, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ছিল, ফলে চিন্তা কী, মন কী— এসবের কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর সেই যুগের বস্তুবাদীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এটা ভাববাদীদের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। এর সুযোগে ভাববাদও সমাজে শক্ত শিকড় তৈরি করেছিল। এই বিষয়টা আলোচনা করতে হচ্ছে যেহেতু সাধারণ মানুষের মধ্যেও আজও এই ভাববাদী ধারণা আছে যে, 'রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে', 'অদৃষ্টের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারবে না'। 'খোদা কি মর্জি, নসিব কা খেল', 'তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি' ইত্যাদি। ফলে তারা মনে করে, এই দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে, তাদের জীবনে সুখ-দুঃখ যা কিছু ঘটছে, 'সব কিছুই পূর্বনির্ধারিত', 'ভগবানের লীলাখেলা'। এমনকী ঈশ্বরবিশ্বাসী কোনও ডাক্তারও বলেন, 'যতটা সম্ভব চিকিৎসা আমি করেছি, বাকি তো বুঝতেই পারছেন, উপরওয়ালার উপরে নির্ভর করছে।' এই যে সুর— অর্থাৎ একটা শক্তি প্রকৃতির বাইরে, বস্তুজগতের বাইরে, একটা সুপার মাইন্ড, একটা অ্যাবসলিউট আইডিয়া জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে— এটাই হচ্ছে ভাববাদী চিন্তা।

ভাববাদী দর্শন অনুযায়ী সবকিছু শাশ্বত, পূর্বনির্ধারিত

তাহলে এই বাস্তব জগৎ কী? এর কি কোনও পরিবর্তন হচ্ছে? সমাজের কি পরিবর্তন হচ্ছে? এই পরিবর্তনের কি কোনও নিয়ম আছে? এই নিয়ম কি জানা যায়? এইসব প্রশ্ন হচ্ছে দর্শনগত প্রশ্ন। এইখানেই ভাববাদী বা ঈশ্বরবিশ্বাসীরা মনে করেন, প্রকৃতির বাইরে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তি কাজ করছে। ভাববাদী দর্শনজগতে রাম বা কৃষ্ণ বলে কিছু নেই। ভারতীয় ভাববাদ বলে, ব্রহ্ম একটা বস্তুবহির্ভূত শক্তি বা একটা অ্যাবসলিউট আইডিয়া, একটা শাশ্বত ভাব সর্বক্ষেত্রে ক্রিয়া করছে যার থেকে বস্তুজগত আসছে আবার তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মার্কসের পূর্ববর্তী জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেছেন একটা অ্যাবসলিউট আইডিয়া বা শাশ্বত ভাব অনন্তকাল ধরে রয়েছে। তার

মধ্যেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় নানা পরিবর্তন হচ্ছে। সেই পরিবর্তন হতে হতেই 'অ্যালিয়েনেশনের' পথে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে এই প্রকৃতিজগৎ এসেছে, এ সমাজ এসেছে। এই প্রকৃতিতে, সমাজ জীবনে যা কিছু পরিবর্তন আমরা দেখছি সেটা সময়ের গতিপথে নতুন কিছু নয়। সেই শাশ্বত ভাবের মধ্যে আগে থেকেই একই সাথে এবং পাশাপাশি নানা স্তর হিসাবে সেটা ছিল, এবং একই প্রক্রিয়ায় নিরন্তর তারই প্রকাশ হচ্ছে, তার মধ্যে বিলীন হচ্ছে, আবার বারবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। হেগেলের এই দার্শনিক তত্ত্ব আমি যেমন বুঝেছি, আমার ভাষায় বললাম। এবার যাঁর থেকে বুঝেছি, সেই মহান এঙ্গেলসের ভাষায় বলছি, ''According to him (Hegel) nature, as a mere 'alienation' of the idea, is incapable of development in time capable only of extending its manifoldness in space, so that it displays simultaneously and alongside of one another all the stages of development comprised in it, and is condemned to an eternal repetition of the same processes.''[৬] এই প্রশ্নে মার্কসের সাথে হেগেলের চিন্তার মৌলিক বিরোধ ঘটে।

আমাদের দেশে বিবেকানন্দও 'অদ্বৈত বেদান্ত' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "...All the forces whether you can call them gravitation, or attraction, or repulsion, whether expressing themselves as heat, or electricity, or magnetism, are nothing but the variations of that unit energy. Whether they express themselves as thought, reflected from Antahkaran, the inner organs of man, or as action from an external organ, the unit from which they spring it what is called the Prana. Again, what is called Prana? Prana is Spandana or vibration. When all this universe shall have resolved back into its primal stage, what becomes of this infinite force? Do they think that it becomes extinct? Of course, not. If it became extinct, what would be the cause of the next wave, because motion is going in wave forms rising, falling, rising again, falling again,... And what becomes of what you call matter? The forces permeate all matter, which all dissolve into Akasha which is the primal matter. Akasha is the primal form of matter. This Akasha vibrates under the action of Prana; and when the next Sristi is coming up, as the vibration becomes

quicker, the Akasha is lashed into all these forms which we call suns, and moons, and systems...Gross matter is the last to emerge and the most external, and this gross matter had the finer matter before it. Yet we see that the whole thing has been resolved into two, but there is not yet a final unity. There is the unity of force, Prana; there is the unity of matter called Akasha. Is there any unity to be found among them again? Can they be melted into one? Our modern science is mute here, it has not yet found its way out; and it is doing so, just as it has been slowly finding the same old Prana and the same ancient Akasha, it will have to move along the same lines. The next unity is the omnipresent impersonal Being known by its old mythological name as Brahma, the four-headed Brahma, and psychologically called Mahat. This is where the two unite...At the end of a cycle, everything becomes finer and finer and is resolved back into primal state from which it sprang, and there it remains for a time, quiescent, ready to spring forth again. That is called Sristi, projection." ("...সব শক্তিই (ফোর্সেস) যাদের মাধ্যাকর্ষণ বা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ যে নামেই বলা হোক অথবা তাপ, বিদ্যুৎ বা চুম্বক যেভাবেই তারা প্রকাশিত হোক না কেন, তারা সেই একক শক্তিরই বিভিন্ন রকমের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের ভেতরের অঙ্গ 'অন্তঃকরণ' থেকে ভাবনা রূপে প্রতিফলিত হোক অথবা বাইরের অঙ্গের থেকে ক্রিয়া হোক, সবেরই উৎস হচ্ছে 'প্রাণ'। আবার 'প্রাণ' কাকে বলা হয়? প্রাণ হচ্ছে স্পন্দন বা কম্পন (ভাইব্রেশন)। যখন এই সমগ্র বিশ্ব তার প্রথমিক স্তরে ফিরে যাবে তখন সেই অসীম শক্তির কী হবে? তারা কি মনে করে ওই শক্তি বিলুপ্ত হবে? অবশ্যই নয়। এটা যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী প্রবাহের কারণ কী হবে, কারণ গতি ঘটছে প্রবাহের মতো — উঠছে, নামছে, আবার উঠছে, নামছে.... তোমরা যাকে পদার্থ বল, তার কী হয়? শক্তি সমূহ যে সকল পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেই পদার্থগুলি 'আকাশে' বিলীন হয় যা পদার্থের মূল উৎস। 'আকাশই' হচ্ছে পদার্থের আদি রূপ (প্রাইমাল)। প্রাণের ক্রিয়ায় আকাশ কম্পিত হয়, এই কম্পন দ্রুততর হওয়ায় পরবর্তী 'সৃষ্টি' আসতে থাকে এবং যাকে আমরা সূর্য, চন্দ্র এবং ব্যবস্থাসমূহ (সিস্টেমস) বলি, আকাশ প্রবল বেগে এসবে রূপান্তরিত হয় (ল্যাশড ইনটু)

। .... প্রথমে পদার্থ সূক্ষ্মতর থাকে, তারপর স্থূল ও স্থূলতর পদার্থ আবির্ভূত হয় এবং যেটা সবচেয়ে বেশি (একসট্রিম) বাহ্যত প্রকাশিত হয়। তবুও আমরা দেখছি সবকিছু দুটিতে মিশছে, (রিজলভড) কিন্তু তবুও চূড়ান্ত ঐক্য হচ্ছে না। শক্তির ঐক্য হচ্ছে 'প্রাণে', পদার্থের ঐক্য হচ্ছে 'আকাশে' কিন্তু উভয়ের মধ্যে কি কোনও ঐক্য পাওয়া যায়? উভয়ে কি একটিতে মিশতে পারে? আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে নীরব এবং এখনও পথ খুঁজে পায়নি, চেষ্টা চালাচ্ছে। যেমন করে ধীরে ধীরে সেই পুরানো 'প্রাণ' ও সেই প্রাচীন 'আকাশ' খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তাকে এই লাইনেই এগোতে হবে। পরবর্তী ঐক্য হচ্ছে সর্বত্র বিরাজমান বিমূর্ত সত্তা, যাকে পুরাকাহিনীতে 'ব্রহ্ম' নামে বলা হয়, চার মাথা বিশিষ্ট 'ব্রহ্ম', যাকে মনস্তাত্তিক দিক থেকে 'মহৎ' বলা হয়। এখানেই উভয়ে (প্রাণ ও আকাশ) ঐক্যবদ্ধ হয়.... একটি চক্রের শেষে (সাইকল) সবকিছু সূক্ষ থেকে সূক্ষতর হতে হতে আদি অবস্থায় ফিরে যায়, সেখানে কিছু সময় থাকে সক্রিয় অবস্থায় পুনরায় আবির্ভূত হওয়ার জন্য। এটাকেই বলা হয় 'সৃষ্টি', বহিঃপ্রক্ষেপণ (প্রজেকশন)"।)

অর্থাৎ, তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, পরম ব্রহ্ম বা মহৎ-ই একমাত্র বাস্তব। 'আকাশ' বলতে তিনি বস্তু বুঝিয়েছেন আর এনার্জিকে বলছেন 'প্রাণ'। তিনি বলেছেন, পরম ব্রহ্ম থেকে এই আকাশ আর প্রাণ এসেছে। প্রথমে বস্তু ও এনার্জি বেরিয়ে আসছে সূক্ষ্ম হয়ে। তারপর প্রাণের সংস্পর্শে 'আকাশ' সূক্ষ্ম থেকে বৃহৎ রূপ নিচ্ছে। তার থেকে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ও বাকি সবকিছুর উদ্ভব ঘটছে। আবার এই বৃহৎ থেকে সূক্ষ্ম হতে হতে প্রাণ ও আকাশ পরম ব্রহ্মে মিলিয়ে যাচ্ছে, পুনরায় একইভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বারবার একইভাবে বিবর্তন (evolution) ও অনুবর্তন (involution) ঘটছে। হেগেল ও বিবেকানন্দ দু'জনেই শাশ্বত ভাবের কথা বললেও দু'জনের পার্থক্য হচ্ছে। বিবেকানন্দ বলেছেন, পরম ব্রহ্ম থেকে আকাশ ও প্রাণ এসেছে, যেটা হেগেলীয় দর্শনে নেই। হেগেলীয় দর্শনে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতেই ভাবের পরিবর্তন ঘটে বলে যে ধারণা আছে, তা বিবেকানন্দের চিন্তায় নেই। কিন্তু দু'জনের চিন্তা অনুযায়ীই এই ধারায় ক্রমাগত বিবর্তন আর অনুবর্তন ঘটে থাকে। তা হলে ভাববাদী দর্শন অনুযায়ী সবকিছুই শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, পূর্বনির্ধারিত। নতুন অথবা পরিবর্তিত বলে কিছু নেই। মার্কসবাদের আলোচনায় এই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক কেন? কারণ, ভাববাদের অনুগামী হলে একজন ধরেই নেবে পুঁজিবাদ, ধনী-গরিব পার্থক্য, শোষণ ব্যবস্থা সবই চিরন্তন বা শাশ্বত। গরিব মানুষ অদৃষ্টের জন্যই গরিব। বড়লোক পূর্বজন্মের

পুণ্যের ফলেই বড়লোক। এই ধরনের চিন্তা সাধারণ মানুষের মনে কাজ করে। এ ধরনের চিন্তা ধরেই নেয় যে, একটা অতিপ্রাকৃত শক্তি কাজ করছে। এইসব প্রশ্নের উত্তর যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা দিতে পারেননি। মার্কসের আগে রাজতন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শন চিন্তার জন্ম দিয়েছিল। যান্ত্রিক বস্তুবাদ বলছে, সবটাই যন্ত্র, মানুষও যন্ত্র, মনও যন্ত্র। এর বাইরে তাঁরা ভাবতে পারেননি। এই চিন্তার দ্বারা তাঁরাও শেষ পর্যন্ত ভাববাদের গণ্ডির মধ্যেই থেকেছেন। যান্ত্রিক বস্তুবাদ মানলে নিউটনের 'prime mover' ধারণার মতো বলতে হয়, এই মানুষরূপী যন্ত্রেরও গতি প্রথম কেউ বা কোনও শক্তি দিয়ে দিয়েছে। আর agnostics বা অজ্ঞেয়বাদীরাও বললেন, সবকিছুই 'unknowable' 'things in themselves'। অর্থাৎ বস্তুর রহস্য বস্তুর মধ্যেই আছে এবং সেটা অজ্ঞেয়। এইসব চিন্তা দ্বারা ভাববাদকে ফাইট করা যায়নি।

মার্কসই প্রথম হেগেলের দর্শনকে ফাইট করে ভাববাদী দর্শনের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। হেগেলের সাথে তাঁর চিন্তার মৌলিক পার্থক্য বোঝাতে মার্কস বললেন, ''To Hegel, ... the process of thinking, which, under the name of 'Idea', he even transforms into an independent subject is the demiargoes (creator) of the real world, and the real world is only the external, phenomenal form of 'the Idea'. With me, on the contrary, the idea is nothing else than the material world reflected by the human mind, and translated into forms of thought.''[৭] অর্থাৎ, হেগেলের ধারণা অনুযায়ী প্রসেস অফ থিঙ্কিং বা চিন্তার প্রক্রিয়া হচ্ছে শাশ্বত ভাব যেটা একটা স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিরাজ করছে, এবং এটাই হচ্ছে বিশ্বজগতের প্রকৃত স্রষ্টা। আর এই বিশ্বজগৎ হচ্ছে চিরন্তন ভাবের বাহ্যিক রূপগত প্রতিফলন। মার্কসই মানবসমাজে প্রথম দেখালেন, বহির্জগৎ মানব মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে চিন্তায় রূপান্তরিত হচ্ছে এবং সেটাই ভাব। পরবর্তীকালে প্রথম মহান লেনিন এবং পরে শিবদাস ঘোষ দেখালেন, এটা আয়নার মতো প্রতিফলন নয়। বহির্জগৎ ও মস্তিষ্কের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এই প্রতিফলন ঘটছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এক জায়গায় আলোচনা করে দেখিয়েছেন, আমাদের চিন্তার উপাদানগুলি পাই বাস্তব জগৎ থেকে আর দৃষ্টিকোণ বা চিন্তার প্রক্রিয়া আমরা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত পাই একটা বিশেষ সমাজসৃষ্ট সমাজমনন বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই দুই মিলে আমরা বিচার করি। সেই জন্য, একই বাস্তব অবস্থার মধ্যে থেকেও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য ভাবনা ও সিদ্ধান্ত আলাদা

হয়ে যায়।

মনে রাখবেন, মার্কসের সময় আজকের মতো বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি ঘটেনি, মানব মস্তিষ্কের গঠন নিয়ে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার ঘটেনি, পাভলভ বা পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার তখন ছিল না। সেই পটভূমিতে চিন্তা ও ভাবের উৎপত্তি কীভাবে হচ্ছে, মার্কসের এই আবিষ্কার যুগান্তকারী ও বিস্ময়কর।

মার্কসই প্রথম বিজ্ঞানকে সত্য নির্ধারণের হাতিয়ার করেন

মার্কসের পূর্বেকার দার্শনিকদেরও তাঁদের নিজ নিজ যুগে অবদান ছিল, কিন্তু তাঁরা যত বড় চিন্তানায়কই হোন না কেন তাঁদের একটা ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ছিল। তাঁরা সেই সময়ে বাস্তব অবস্থায় নিজ নিজ চিন্তাপ্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নিজস্ব সত্যোপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন। মার্কসবাদের ভিত্তিতে আমরা জানি— মানব ইতিহাসের যেকোনও যুগে যেকোনও চিন্তা বা যেকোনও দর্শন আসুক না কেন, তার উৎপত্তির উপাদান সেই যুগের বাস্তব অবস্থার মধ্যেই ছিল। যদিও তাঁরা সেটা জানতেন না। সেযুগে মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি আসেনি। ফলে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে তাঁরা বিচার করতেন না। তাঁরা ভাবতেন, 'আমার মন ভাবছে, আমি চিন্তা করে বুঝছি। আমার মননশীলতা যা বলছে, আমার চিন্তা যা বলছে, এ জগৎকে যেভাবে দেখছি, সেটাই সত্য'। আর যাঁরা প্রকৃতিজগৎবহির্ভূত শাশ্বত ভাব ও super mind-এ বিশ্বাস করতেন, তাঁরা মনে করতেন সেইখান থেকেই তাঁদের মনে বা mind-এ ভাবনা আসছে। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা মনে করতেন, তাঁরা ভগবানের বাণী বা নির্দেশ পেয়েছেন। এইভাবে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই ধারণাগুলির কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয়— তা কী দিয়ে বিচার হবে? সত্য যদি বিশেষ সত্য হয়, সেটাই বা নির্ধারণ হবে কী করে? যেমন জল কী, এ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা একটাই। কারও মনগড়া ধারণা এখানে চলে না, কারণ এটা পরীক্ষিত সত্য। যদি একই বিষয়ে এক এক দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেন, তাহলে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। এখানেই মার্কসের আর একটি ঐতিহাসিক অবদান। মার্কসই প্রথম দার্শনিক যিনি সত্য নির্ধারণের হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলেন। মার্কসের সময় আধুনিক বিজ্ঞান এসেছিল, যেটা পুরনো যুগের দার্শনিকদের সামনে ছিল না। তিনি বললেন, এই আধুনিক বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করেই দর্শন জগতে সত্য অনুসন্ধান করতে হবে। তাই মার্কসবাদ হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। মার্কসের আগে ও পরে অন্য

কোনও দর্শন বিজ্ঞানকে সত্য নির্ধারণের হাতিয়ার করতে পারেনি। এজন্যই মার্কসবাদকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে যেকোনও ঘটনা যেকোনও বিষয় সম্পর্কে একই এবং বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া যায়। বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রাশাখা আছে— ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বটানি, জুলজি, জিওলজি, জিওগ্রাফি ইত্যাদি। মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আর এইসব বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী? এর উত্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, এই শাখাগুলো বস্তু জগতের এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করছে— কেমিস্ট্রি বস্তুজগতের একটা বিশেষ ফিল্ডে, ফিজিক্স আর একটা বিশেষ ফিল্ডে, বায়োলজি-বটানি একেকটা বিশেষ ফিল্ডে কাজ করছে। বিশেষ সত্য বা নিয়ম জানার জন্য বস্তুর রাসায়নিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করছে কেমিস্ট্রি, তেমনি ফিজিক্স করছে ভৌত গুণগুলি, বায়োলজি করছে সজীব প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলি এবং এইভাবে চলছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ আবিষ্কৃত যে সত্য, বিশেষ যে নিয়ম, সেই বিশেষ নিয়মগুলোকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় কো-অর্ডিনেট করে, কো-রিলেট করে তার থেকে বস্তুজগতের ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন নিয়মগুলি মার্কস আবিষ্কার করলেন। এই নিয়মগুলি বস্তুজগতের বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন ক্রিয়াশীল, আবার এই সাধারণ নিয়মগুলি দ্বারা সমাজসহ বস্তুজগৎকে সামগ্রিকভাবে as a whole system of discipline স্টাডি করা যায়। এই নিয়মগুলি হচ্ছে three principles of dialectics. অর্থাৎ unity and struggle between the opposite forces, quantitative changes to qualitative changes and vice-versa এবং negation of negation। বস্তুত, হেগেলই প্রথম ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বান্দ্বিকতার এই তিনটি সূত্রের কথা চিন্তা করেন। এঙ্গেলস এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'ডায়ালেক্টিকস অফ নেচার'-এ বলেছেন, "এ সবই (দ্বান্দ্বিকতার তিনটি সূত্র) হেগেল তাঁর নিজস্ব ভাববাদী ঢঙে বলেছেন নিছক চিন্তার সূত্র হিসাবে (laws of thought)। প্রথমটি বলেছেন তাঁর 'লজিক' রচনার প্রথম অংশে, অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁর মতবাদে। দ্বিতীয়টি তাঁর 'লজিক' রচনার প্রায় সমগ্র দ্বিতীয় ও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'ডকট্রিন অফ এসেন্স' নামে। তৃতীয়টি তাঁর সমগ্র 'সিস্টেম' দাঁড় করাবার ক্ষেত্রে মৌলিক সূত্র হিসাবে অবস্থান করছে। ভুলটা হয়েছে এটাই যে, এই নিয়ম বা সূত্র চিন্তার এই প্রকৃতি ও ইতিহাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতি ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করে নিরূপন করা হয়নি" ["All these (three principles of dialectics) are developed by Hegel in his idealist fashion as

mere laws of thought; the first in the first part of his *Logic, in the doctrine of being*; the second fills the whole of the second and by for the most important part of his *Logic, the Doctrine of Essence*; finally the third figures as the fundamental law of the construction of the whole system. The mistake lies in the fact that these laws are foised on nature and history as laws of thought and not deduced from them."]। মার্কস বাস্তবকে সামনে রেখে দেখালেন, এই ইউনির্ভাসাল বা বিশ্বজনীন নিয়মগুলি বিজ্ঞানের প্রতিটি ফিল্ডেই প্রযোজ্য— প্রকৃতি জগৎ, প্রাণীজগৎ এবং মানব জীবনের প্রতিটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সভায় এই নিয়মগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করার সুযোগ নেই। শুধু বলতে চাই, মার্কস দেখালেন— unity and struggle between the opposite forces বা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই গতির কারণ, যেটা বিজ্ঞানেও আবিষ্কৃত। যেমন বিজ্ঞান দেখিয়েছে, একটা অ্যাটমের মধ্যে পজিটিভলি চার্জড প্রোটন ও নেগেটিভলি চার্জড ইলেকট্রন কাজ করছে। নিউটনিয়ান মেকানিক্সকে ভিত্তি করে এর আগে ভাবা হত, বস্তুর গতি প্রথম বাইরের থেকে দেওয়া হয়েছে (প্রাইম মুভার)। কিন্তু পরবর্তীকালে মার্কস বললেন এবং বিজ্ঞান প্রমাণ করল প্রত্যেকটি বস্তু গতিশীল এবং তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই তার গতির কারণ। বস্তুর অবস্থানই দ্বন্দ্বের মধ্যে, এই দ্বন্দ্ব থেকেই বস্তুর গতিশীলতা, আর গতিশীল বস্তুতে-বস্তুতে দ্বন্দ্ব-সমন্বয় চলছে। পরিবর্তন মানেই গতি। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্ব নিয়েই বস্তুর অবস্থান। গোটা বিশ্বময় সমস্ত ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব চলছে। বস্তু সৃষ্টি করা যায় না, বস্তু ধ্বংস করা যায় না। বস্তু নিয়ত গতিশীল, পরিবর্তনশীল। তাই বস্তুকে কাউন্ট করার জন্যই অঙ্কশাস্ত্র এসেছে। অঙ্কে ফার্স্ট অথবা লাস্ট নাম্বার বলে কিছু নেই। '১' কেও এমনকী অসংখ্য ভাগ করা যায়। এজন্যই বস্তুর চূড়ান্ত শুরু বা চূড়ান্ত শেষ বলে কিছু নেই। বস্তুর আপেক্ষিক শুরু আছে, আপেক্ষিক শেষ আছে। একটা বস্তু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আর একটা বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এই অর্থে একটি বিশেষ বস্তুর শুরু আছে, এই অর্থে তার শেষ আছে। যেখানে শেষ করল, সেখান থেকে আর একটা অবস্থানে যাচ্ছে। এটা বিরামহীনভাবে চলছে। ফলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মার্কসের কোনও কাল্পনিক চিন্তা নয়। আধুনিক বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে ভিত্তি করে মার্কসই প্রথম মানবজাতির সামনে এই বৈজ্ঞানিক দর্শন উপস্থিত করলেন।

মার্কস দেখালেন শ্রমিকশ্রেণিকে নিজের মুক্তির প্রয়োজনেই দর্শন চর্চা করতে হবে

মার্কসের একটি ঐতিহাসিক উক্তি আছে— তিনি বলেছেন, ''The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it.''[৮] অর্থাৎ, দুনিয়া সম্পর্কে এতদিন দার্শনিকরা শুধু নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা সমাজের কল্যাণে আসছে কি আসছে না, এসব প্রশ্ন তাঁরা ভাবেননি। সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবেননি। কিন্তু সঠিক দর্শন চর্চার মূল উদ্দেশ্য কী হবে? জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য কী হবে? জ্ঞানচর্চা হোক, দর্শনচর্চা হোক, সত্যানুসন্ধান হোক, তার উদ্দেশ্য কী হবে? আমাদের যে জীবন, যে বিশ্ব দুনিয়ার সম্মুখীন আমরা, যে সমাজ ব্যবস্থার আমরা সম্মুখীন— যার মধ্যে আমাদের বাঁচতে হচ্ছে, লড়তে হচ্ছে, বাঁচার জন্য এই অবস্থার পরিবর্তনে আমরা কীভাবে চিন্তাকে প্রয়োগ করতে পারি, দর্শনকে প্রয়োগ করতে পারি, এটাই তো উদ্দেশ্য হবে। এই উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে শুধু দর্শন নিয়ে কচকচি করে লাভ কী? মানব কল্যাণে, মানুষের জীবনের পরিবর্তনে ক্রিয়া না করে 'বিশুদ্ধ' জ্ঞান চর্চায় লাভ কী? জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টোমলজির ক্ষেত্রেও মার্কসের এই ঐতিহাসিক বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম পরিবর্তনের জন্য মানুষের ক্রিয়ার সাথে দর্শন চর্চা বা জ্ঞান চর্চাকে সচেতনভাবে যুক্ত করে নতুন দিগদর্শন আনলেন। এর মানে একথা কেউ ধরে নেবেন না, অন্য দর্শনগুলো সমাজ পরিবর্তনে কোনও ভূমিকা নেয়নি। ভূমিকা নিয়েছে মানুষের অজ্ঞাতসারে, দার্শনিকদেরও অজ্ঞাতসারে। তাঁরা কেউ সমাজ পরিবর্তনের সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে দর্শন চর্চা করেননি। কিন্তু দার্শনিক চিন্তাগুলি তো সেই সেই সময়ের বাস্তব পরিবেশের উপাদান নিয়েই গড়ে উঠেছিল, ফলে সেইসব সমাজের প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল মনন গঠনে সেই সব দর্শনগুলি ভূমিকা নিয়েছে।

এখানে মার্কসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করা দরকার। সেটা হচ্ছে, প্রচলিত ধারণা ছিল, যেটা আজও ব্যাপকভাবে আছে, মুষ্টিমেয় কিছু জ্ঞানী লোক দর্শনের মতো জটিল বিষয় চর্চা করবে, সাধারণ মানুষের এসব বুদ্ধির অগম্য। মার্কসই প্রথম দেখালেন, সাধারণ মানুষ, শ্রমিকশ্রেণি নিজের মুক্তির প্রয়োজনে দর্শন এবং বিশেষভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন চর্চা করবে। তাই বলছেন, এতদিন পর্যন্ত দার্শনিকরা নানাভাবে শুধু দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু দর্শনচর্চার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, দুনিয়ার পরিবর্তন ঘটানো।

মার্কস সমাজ পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি আবিষ্কার করেন

মার্কসের আর একটি অবদান হচ্ছে, মানব সমাজের পরিবর্তন বিচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে সমাজ পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি আবিষ্কার করা। ইতিহাস মানে বিভিন্ন রাজা-রাজড়াদের কাহিনি বা বিভিন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের কার্যকলাপই সমাজ পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, এরকমই আগে বোঝানো হতো। একটা সমাজের পর আর একটা সমাজ কেন আসছে, কেন পর পর আদিম সমাজ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র ও তারপর পুঁজিবাদ এল, এর পিছনে কোনও নিয়ম আছে কি নেই, নাকি এটা 'বিধির বিধান' বা কার্যকারণ বহির্ভূত কিছু আকস্মিক ঘটনা মাত্র— ইতিপূর্বে এসব নিয়ে কোনও সঠিক ধারণা ছিল না। কারণ, এতদিন ইতিহাসে এর কোনও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়নি, কোনও সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি। মার্কসই প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে মানব ইতিহাসকে সঠিকভাবে বিচার করে দেখালেন যে বস্তুজগতে যেমন কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মে মৌলিক রূপান্তর বা পরিবর্তন ঘটছে, যে নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করা যায়, জানা যায়, বোঝা যায় এবং সেভাবে মানুষ বিজ্ঞান প্রয়োগ করে, প্রকৃতির নিয়মকে জেনে বুঝে মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে, তেমনই মানব সমাজও একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলছে এবং সেই নিয়মকে জেনে বুঝে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা মানুষ নিতে পারে। মার্কস বললেন, মানুষের সাথে প্রকৃতির লড়াই হচ্ছে বাঁচার জন্য লড়াই। বাঁচতে হলে মানুষের খাদ্য চাই। প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে, খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। অর্থাৎ বাঁচার জন্য খাদ্য চাই, আশ্রয় চাই, বাসস্থান চাই, পোশাক-পরিচ্ছদ চাই এবং এই উৎপাদনগুলি করার জন্য এবং নানা জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নানা হাতিয়ার চাই, যা কিছু প্রকৃতির উপাদান থেকেই সংগ্রহ করে তৈরি করতে হবে। এইগুলি করা হচ্ছে উৎপাদন করা। তাহলে মানুষ প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করছে, প্রকৃতি থেকে উৎপাদন করছে। এই উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছে, যেহেতু সে একা উৎপাদন করতে পারে না। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে, সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ উৎপাদন করছে। ফলে যে কোনও সমাজ ব্যবস্থা মানেই হচ্ছে মানুষের এই উৎপাদন এবং উৎপাদন সম্পর্ক। একটা উৎপাদন বস্তুগত, প্রকৃতি থেকে যেটা করছি, আবার উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষকে ভাবতে হচ্ছে, অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান হচ্ছে। মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক যা অন্য কোনও প্রাণীর নেই, যার জন্য

অন্যান্য কোনও প্রাণী উৎপাদন করতে পারেনি, সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারেনি দৈহিক শক্তিতে বলবান থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু প্রাণী নিশ্চিহ্নও হয়ে গেছে। মানুষের মস্তিষ্ক উন্নত হওয়ায়, অতি developed brain with extended developed ceribral cortex থাকায় মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। ফলে মানুষকে প্রকৃতির সাথে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়ে ভাবতে হচ্ছে, অভিজ্ঞতা ঘটছে, অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে হচ্ছে। ফলে একটা বস্তুগত উৎপাদন হচ্ছে, আর একটা ভাবগত উৎপাদন হচ্ছে। Material production, spiritual production উভয়ই সমাজে হচ্ছে, মানুষই করছে। ফলে যেকোনও সমাজ ব্যবস্থা আছে মানে একটা production system আছে। এই সম্পর্কে মার্কসের ভাষায় বলছি, ''In production men not only act on nature but also on one another. They produce only by co-operating in a certain way and mutually exchanging their activities. In order to produce, they enter into definite connections and only within these social connections relations does their action on nature, does production, take place.''[৯] অর্থাৎ, উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ শুধু প্রকৃতির উপরই ক্রিয়া করে তাই নয়, একে অপরের উপরও ক্রিয়া করে। তারা একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সহযোগিতা করে ও ক্রিয়া কলাপের আদান প্রদান করেই উৎপাদন করে। উৎপাদন করার প্রয়োজনে তারা একে অপরের সাথে একটা সুনির্দিষ্ট সংযোগও স্থাপন করে এবং শুধুমাত্র এই সামাজিক সংযোগ ও সম্পর্কে থেকেই তারা প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে, উৎপাদন সম্পাদিত হয়। মার্কসের এই বক্তব্যে অত্যন্ত পরিষ্কার যে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও সহযোগিতা ছাড়া উৎপাদন হতে পারে না। তারপর তিনি বলছেন, ''...these relations of production correspond to a definite stage of development of their material forces of production ...''[১০] অর্থাৎ, এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি একটা সুনির্দিষ্ট বাস্তবে বিদ্যমান উৎপাদন শক্তির (material forces) সাথে সামঞ্জস্য রেখেই গড়ে ওঠে। এই উৎপাদন শক্তি কী, সে সম্পর্কে স্ট্যালিন ব্যাখ্যা করে দেখালেন, ''The instruments of production wherewith material values we produce, the people who operate the instruments of production and carry on the production of material values thanks to a certain production experience and labour still– all these elements jointly constitute the productive forces of society.''[১১] অর্থাৎ, যেসব উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করে বস্তুগত সম্পদ উৎপাদিত হয় এবং যে জনগণ উৎপাদন যন্ত্র

ব্যবহার করে সম্পদ উৎপাদন করছে— এই দুই নিয়েই উৎপাদন শক্তি। এরপর আবার মার্কসের বক্তব্য উল্লেখ করছি, তিনি বলছেন, ''The sum total of these relations of production constitute the economic structure of the society, the real foundation on which rises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social cosciousness.''[১২] অর্থাৎ, এই উৎপাদন সম্পর্কগুলির সমূহ যোগফলই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করে এবং সেটা হচ্ছে প্রকৃত ভিত্তি, যার উপরে রাজনৈতিক ও আইনগত উপরকাঠামো (superstructure) গড়ে ওঠে এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটা বিশেষ সুনির্দিষ্ট সামাজিক চেতনা জন্ম নেয়। এই বিচারের ভিত্তিতেই তাঁর বিখ্যাত উক্তি, ''It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness.''[১৩] অর্থাৎ, মানুষের চেতনা তার সত্তা নির্ধারণ করে না, বরং তার সামাজিক সত্তাই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে।

উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সমাজ পরিবর্তিত হয়

এরপর সমাজে কেন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে সেই সম্পর্কে তিনি বলছেন, ''At a certain stage of their development, the material productive forces of society come in conflict with the existing relation of production, ... From forms of development of the productive forces these relations turn into their fetters. Then begins an epoch of social revolution. With the change of the economic foundation the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed.''[১৪] অর্থাৎ, মার্কস বলছেন, উৎপাদন বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে এসে উৎপাদন শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের সংঘর্ষ দেখা দেয়, ... (কারণ, এই স্তরে) উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশের সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে শৃঙ্খল হিসাবে দেখা দেয়। তখনই সমাজ বিপ্লবের একটি যুগের সূচনা হয়। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের পর সমগ্র বৃহৎ উপরকাঠামোও কমবেশি দ্রুত পাল্টে যায়।

মার্কসের উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা যা পেলাম সেটা অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায় যে, বাঁচার তাগিদে মানুষ প্রকৃতি থেকে উৎপাদন করতে গিয়ে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তোলে।

উৎপাদন শক্তি হচ্ছে যে মানুষগুলি উৎপাদন করে এবং তারা যে হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করে—এই দুইটি। আর উৎপাদন সম্পর্ক হচ্ছে এই উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ নিজেদের মধ্যে যে সম্পর্ক ও সহযোগিতা স্থাপন করে। এই উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রেখেই উৎপাদন শক্তি ক্রিয়া করে বা উৎপাদন করে। এই উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক মিলে প্রতিটি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো (structure) বা ভিত্তি স্থাপন করে এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের চেতনা, রীতি-নীতি-ন্যায়-অন্যায় বোধ, আইন-কানুন-শাসন, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা-সামাজিক সম্পর্ক, নর-নারীর সম্পর্ক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে ওঠে এবং সেটা হচ্ছে সমাজের উপরকাঠামো (superstructure)। উৎপাদন শক্তি বিকাশ করতে করতে একটা সময় আসে যখন প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক তার অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তখন সামাজিক উৎপাদনের অগ্রগতির স্বার্থেই নতুন উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে উৎপাদন শক্তির সাথে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেয়। এটাই সমাজ বিপ্লবের সূচনা করে। আবার অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের এই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ সেই সমাজের উপরকাঠামোয় মানুষের চেতনা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, ফলে সেখানে এই দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়। ফলে সমাজের কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমবেশি দ্রুততার সাথে উপরকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। নতুন কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে নতুন উপরকাঠামো গড়ে ওঠে।

এই সম্পর্কে মার্কসবাদের শিক্ষার ভিত্তিতেই বলছি যে, কাঠামোর অভ্যন্তরে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে সংঘাত ও সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে ভিত্তি করেই উপরকাঠামোতে মানুষের চেতনা হিসাবে এই দ্বন্দ্ব অনুভূত হয় এবং কাঠামোর সংঘর্ষে লিপ্ত উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক এই উভয় শক্তিরই সংঘর্ষ উপরকাঠামোতেও পুরনো ও নতুন চিন্তা ও দুই ভাবধারার সংঘর্ষ হিসাবে দেখা দেয়। ফলে কাঠামোকে ভিত্তি করে উৎপাদন শক্তির বিকাশের স্বার্থে উপরকাঠামোতে যে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেটাই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু শ্রেণি বিভক্ত সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের মালিক শোষক শ্রেণি সচেতনভাবে উৎপাদন সম্পর্কের এই পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করে। আর উৎপাদন শক্তিকে অর্থাৎ শ্রমশক্তিকে এর বিরুদ্ধে লড়তে হয়। ফলে উপরকাঠামোতে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির লড়াই হয়। এ কথাও মনে রাখতে হবে, প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী spontenously বা

স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু মানব সমাজের পরিবর্তনে চেতনা গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান ভূমিকা পালন করে, হয় তা পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে, না হয় পরিবর্তনে বাধা দেয়। তার ফলে প্রগতিশীল বা বিপ্লবী শক্তি যতক্ষণ সচেতন, সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী না হচ্ছে, ততক্ষণ প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন সম্পর্ক বা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। আবার এটাও সত্য যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যত দ্রুত আমূল পরিবর্তন ঘটে, উপরকাঠামোর অন্তর্ভূক্ত রীতি-নীতি-আচার-আচরণ-অভ্যাস-জীবনধারা ইত্যাদির সাথে সাথেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটে না, দীর্ঘ দিন ধরে অতীতের অবশেষ (hangover) হিসাবে থেকে যায়।

সমাজ শ্রেণি বিভক্ত হওয়ার পর শ্রেণি সংগ্রামই সমাজ বিপ্লবের চালিকাশক্তি

যাই হোক, এতক্ষণ ধরে মার্কসের বক্তব্য থেকে এই শিক্ষা আমরা পেলাম যে, কোনও দৈবশক্তির ইচ্ছাতে নয়, খাপছাড়া কোনও ঘটনা হিসাবে নয়, মহান ব্যক্তিদের ইচ্ছাতেও নয়, প্রকৃতি জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সমাজও একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মেই নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং সেই নিয়ম হচ্ছে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। এই নিয়ম সমস্ত যুগের সকল সমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অর্থাৎ ইউনিভার্সাল। এও মার্কসের একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। তারপর মার্কস দেখালেন, ‘‘ever since the dissolution of the primeval communal ownership of land all history has been a history of class struggles, of struggles between exploited and exploiting, between dominated and dominating classes at various stages of social revolution...’’[১৫] অর্থাৎ, আদিম সমাজে জমির উপর কমিউনিটির মালিকানার অবসানের পর সকল ইতিহাস হচ্ছে, বিভিন্ন স্তরে সামাজিক বিপ্লবে শোষক ও শোষিতের মধ্যে, আধিপত্যকারী ও অধীনস্থদের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রাম। অর্থাৎ দাসপ্রভু ও দাস, এরপরে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস, তারপরে পুঁজিপতি ও শ্রমিক, এদের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামই ইতিহাসের চালিকাশক্তি। এইসব স্তরে এটাই হচ্ছে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত। ফলে যে প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ দাস ও উদীয়মান বুর্জোয়া সহ ভূমিদাসদের সংগ্রামের ফলে যথাক্রমে দাসপ্রথা ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে, একইভাবে শ্রমিক শ্রেণি পরিচালিত সচেতন শ্রেণি সংগ্রামের ফলে পুঁজিবাদ থেকে প্রথমে সমাজতন্ত্র, তারপর সকল শ্রেণির অবলুপ্তি ঘটিয়ে সাম্যবাদ

প্রতিষ্ঠিত হবে, এরপর ইতিহাসের নিয়মে আরও উন্নত থেকে উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা আসবে। এটাই ইতিহাসের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। আবার এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হবে তা নয়, যতক্ষণ উৎপাদন শক্তির অন্তর্ভুক্ত শোষিত জনগণ সচেতন, সংঘবদ্ধ হয়ে উৎপাদন সম্পর্কের মালিক শোষকদের উচ্ছেদ করতে সফল না হচ্ছে, ততক্ষণ প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার যতই সংকট আসুক, উৎপাদন সম্পর্ক যতই শৃঙ্খল রূপে ক্রিয়া করুক, আপনাআপনি সেটা ধ্বংস হবে না। এই প্রশ্নে চেতনার ভূমিকা প্রধান। প্রগতিশীল চেতনা অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে, আবার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা-ধারণা অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির সাথে মানব সমাজের এইখানে পার্থক্য আছে। কারণ মানুষ এখানে চেতনার ভিত্তিতে একটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতিতে সবই ডেভেলপমেন্ট মানে নতুন পরিবর্তন। মানব সমাজে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্তন— এই ধারণা এসেছে মানুষের কল্যাণের প্রশ্নকে যুক্ত করে। ফলে, মনে রাখবেন, ইতিহাসে মার্কসই প্রথম কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিকদের (utopian socialists) মৌলিক ভ্রান্তি দূর করে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের (scientific socialism) ধারণা উপস্থিত করলেন।

সারপ্লাস ভ্যালু— মার্কসের একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার

সারপ্লাস ভ্যালু (উদ্বৃত্ত মূল্য) মার্কসের আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। মার্কস দেখিয়েছেন, শ্রমিককে বঞ্চিত করে মালিক এই সারপ্লাস ভ্যালু অর্জন করে এবং এটাই হল মালিকের মুনাফার উৎস। এর আগে ক্লাসিক্যাল ইকোনমিতে অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডো দেখিয়েছেন, শ্রমই হচ্ছে সকল সম্পদ (wealth) বা মূল্যের (value) স্রষ্টা। এই বলেই তাঁরা থেমে গেলেন, আর এগোতে পারলেন না। তাঁদের এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করেই মার্কস প্রশ্ন তুললেন, তাহলে শ্রমশক্তি দিচ্ছে যারা, তারা কেন সকল সম্পদের মালিক হচ্ছে না, কেন এক দল মালিক এই সম্পদ আত্মসাৎ করছে, আর শ্রমিকরা সর্বহারা হচ্ছে? মার্কস দেখালেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকরা পুঁজিকে দুইভাবে কাজে লাগায়। একটা কনস্ট্যান্ট ক্যাপিটাল অর্থাৎ স্থায়ী পুঁজি, যার পরিবর্তন হয় না, এই পুঁজি দিয়ে মালিক উৎপাদন যন্ত্র ও কাঁচামাল কেনে। আর একটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ক্যাপিটাল অর্থাৎ যে পুঁজি পরিবর্তনশীল। এই পুঁজি দিয়ে মালিক নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমশক্তি কেনে, শ্রমিককে তাদের সেই পরিমাণ মজুরি দেয় যার দ্বারা সে ও তার পরিবার খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। এখন ধরুন, একজন মালিক কনস্ট্যান্ট ক্যাপিটাল খাতে ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে ১টি কাপড়ের

মেশিন কিনল, যে মেশিন এক বছর কাজ করলে প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা রিটার্ন দেবে। তারপর এক মাসের জন্য মাসে ৫০০০০ টাকা দিয়ে কাঁচামাল সুতো কিনল। আর ভ্যারিয়েবল ক্যাপিটাল খাত থেকে এক মাসে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে শ্রমশক্তি কিনল। এরপর ১ মাসে যে কাপড় উৎপাদন হল তার বাজার দর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এখন ধরুন, মেশিন প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা রিটার্ন দিচ্ছে, ৫০০০০ টাকা দামের সুতোর মূল্য তো কাপড়ের মধ্যেই আছে, আর শ্রমিক শ্রমের মাসিক মজুরি পেয়েছে ১ লক্ষ টাকা। তাহলে মোট উৎপাদন ব্যয় দাঁড়াচ্ছে, মেসিনের দামের ১ মাসের রিটার্ন হচ্ছে ১ লক্ষ টাকা, সুতোর ১ মাসের মূল্য বাবদ ৫০ হাজার টাকা এবং শ্রমশক্তি ১ মাসের মূল্য ১ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মোট আড়াই লক্ষ টাকা। অথচ কাপড়ের দাম হচ্ছে ধরুন ৩৫০০০০ টাকা, তাহলে বাড়তি ১ লক্ষ টাকা যেটা সারপ্লাস হল, সেটা কোত্থেকে এল? অর্থাৎ ২৫০০০০ টাকার ভ্যালু সারপ্লাস হয়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা কী করে দাঁড়াল? এখানেই মার্কস দেখাচ্ছেন, যে শ্রমশক্তিকে মালিক ১ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছে, তাকে দিয়ে মাসে দৈনিক যে ৮ ঘন্টা কাজ করিয়েছে, তার ৪ ঘন্টার দাম মাসে ১ লক্ষ টাকা, বাকি ৪ ঘন্টার দাম মালিক দেয়নি। এই ৪ ঘন্টা হচ্ছে সারপ্লাস লেবার, আর এখান থেকেই আসে 'সারপ্লাস ভ্যালু' বা মালিকের লাভ। অর্থাৎ শ্রমিককে দিয়ে বাড়তি শ্রম করিয়ে সেই অর্থ মালিক আত্মসাৎ করছে। একইভাবে স্তরে স্তরে কাপড়ের মেশিন যেখানে তৈরি হচ্ছে, ইস্পাত যেখানে তৈরি হচ্ছে, যে খনি থেকে লোহার আকর তুলে আনা হচ্ছে, যে কারখানায় সুতো হচ্ছে, যে মাঠে কার্পাস চাষ হচ্ছে— সর্বত্রই মালিকরা এইভাবে শ্রমিককে বাড়তি খাটিয়ে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে লাভ লুটছে। এছাড়া কোনওভাবেই মালিক লাভ করতে পারে না। অন্যদিকে পুঁজিপতিরা যে পুঁজি বিনিয়োগ করে, তারও স্রষ্টা শ্রমিকশ্রেণিই। টাকার আলাদা কী মূল্য আছে! টাকা এসেছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, যা দিয়ে শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদ বা পণ্য কেনা যায়। তাহলে আসল হচ্ছে উৎপাদিত সম্পদ বা ওয়েলথ উৎপন্ন হয় শ্রমশক্তির দ্বারাই। এই অর্থে পুঁজিরও স্রষ্টা শ্রমশক্তি, পুঁজিপতিরা নয়। মার্কস দেখালেন, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত এই শ্রমিকই বাজারের অধিকাংশ ক্রেতা, যারা ন্যায্য মজুরি না পাওয়ায় প্রয়োজন মতো পণ্যসামগ্রী কিনতে পারে না। এর ফলে অনিবার্যভাবেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাজার সংকট সৃষ্টি করবে, বাজারের সংকোচন ঘটাবে। এখানে আমি আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, মার্কসের সময় এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন শ্রমিকের পরিবার সহ বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হত, আজ সেটাও নেই। কারণ, সব

দেশেই অর্থনৈতিক মন্দা প্রায় স্থায়ীভাবে রয়েছে। এজন্য উৎপাদন সংকুচিত হচ্ছে, কল-কারখানায় লক আউট-ক্লোজার হচ্ছে, কোটি কোটি বেকার ও কর্মচ্যুত শ্রমিক সর্বত্র মরিয়া হয়ে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থায় শ্রমিকের কোনও কাজের সুযোগ না থাকায় মালিক সামান্য যা মজুরি দেয়, তা মেনেই কাজ করতে তারা বাধ্য হচ্ছে— এতে শ্রমিক সপরিবারে বাঁচুক মরুক, এ নিয়ে আর মালিকের মাথাব্যথা নেই। যাই হোক, সারপ্লাস ভ্যালু আবিষ্কার করে মার্কসই প্রথম দেখালেন সম্পদের স্রষ্টা যে শ্রমিকশ্রেণি, পুঁজিবাদ কীভাবে তাদের নির্মম শোষণ করে মুনাফা লুটছে। ফলে পুঁজিবাদের ন্যায়ের ধারণা হচ্ছে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য উন্মোচিত করে দেওয়ার জন্য মানব সমাজ মার্কসের কাছে অশেষ ঋণী।

পুরনো বস্তুবাদের ধারণার সাথে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ধারণার মৌলিক পার্থক্য বোঝাতে মার্কসের একটি ঐতিহাসিক উক্তি আছে যেটা ফুয়েরবাক সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বলেছেন। পূর্বেকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের বস্তুবাদী চিন্তানায়করা অর্থাৎ যান্ত্রিক বস্তুবাদ, অজ্ঞেয়বাদ ও সেকুলার মানবতাবাদের প্রবক্তারা যেহেতু বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেচিন্তা করেননি, তাঁদের মননসর্বস্ব বা contemplative materialist আখ্যা দিয়ে মার্কস বলেছেন, "The highest point attained by contemplative materialism, that is materialism which does not comprehend sensuousness as practical activity, is the contemplation of single individuals in 'civil society'."[১৬] আর তাঁর নতুন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কে বলছেন, "...the standpoint of the new is human society, or socialised humanity."[১৭] অর্থাৎ, তিনি বলছেন, মননসর্বস্ব বস্তুবাদ, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে ব্যবহারিক ক্রিয়া বলে গণ্য করে না, তা (বুর্জোয়া) নাগরিক সমাজে বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তির ধারণা করেছে। আর মার্কস প্রদর্শিত নতুন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মানবিক সমাজ বা সমাজিকৃত মানবজাতির ধারণা উপস্থিত করেছে। এর দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন, যেহেতু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেই জন্য সেই সময়ের বস্তুবাদীরা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগ করে তিনি দেখালেন, আগামী দিনে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পর সমাজতন্ত্র অতিক্রম করে সমাজ যখন সাম্যবাদে পৌঁছাবে, তখন ব্যক্তিস্বার্থ বলে আলাদা কিছু থাকবে না, সমগ্র মানবজাতিই সমাজিকৃত হয়ে যাবে। এটাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ পরবর্তীকালে

ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তি শুধু ব্যক্তি সম্পত্তি থেকে মুক্তই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে।

সাম্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে মার্কস-এঙ্গেলস 'ম্যানিফেস্টো অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি'-তে বলেছেন, ''In place of the old bourgeois society with its classes and class antagonisms, we shall have an association, in which the free development of each is the condition for the free development of all.'' অর্থাৎ, বিভিন্ন শ্রেণি ও শ্রেণির বিরোধাত্মক শ্রেণিদ্বন্দ্বসম্পন্ন বুর্জোয়া সমাজের পরিবর্তে যখন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশই হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।

ফুয়েরবাক ও মার্কস

একথাও আপনাদের হয়তো জানা আছে যে মার্কস প্রথমে বামপন্থী হেগেলিয়ান ফুয়েরবাকের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি ফুয়েরবাকের ভ্রান্তি বা সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারলেন। কারণ, যদিও ফুয়েরবাক হেগেলের অ্যাবসলিউট আইডিয়া বা শাশ্বত ভাবকে অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু বাস্তবে মানুষের মধ্যে যে ভাব বা চিন্তা সৃষ্টি হয়, সেটা কীভাবে সৃষ্টি হয় তার কোনও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। পরবর্তীকালে মার্কস সেটা দেখিয়েছেন, বস্তুসৃষ্ট মানুষের মস্তিষ্কের সাথে বস্তুময় পরিবেশের দ্বন্দ্বের ফলেই চিন্তার উৎপত্তি ঘটে এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশের ফলে চিন্তাও পরিবর্তনশীল হয়, এই জন্যই শাশ্বত চিন্তা বা ভাব থাকতে পারে না। এটা ফুয়েরবাক বুঝতে পারেননি। আবার সমাজজীবনে যে নানা ভাবনা, আদর্শের অস্তিত্ব আছে এটাও ফুয়েরবাক অস্বীকার করতে পারেননি। তার ফলে মার্কসের ভাষায়, ''The human essence, therefore, can with him (Feuerbach) be comprehended only as 'genus', as an internal, dumb generality which merely naturally unites the many individuals. ...But the human essence is no abstraction inherent in each single individual. In its reality it is the ensemble of the social relations.''[১৮] অর্থাৎ, মার্কস দেখালেন, ফুয়েরবাকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষের চিন্তাভাবনা, রীতিনীতি, আদর্শকে বুঝতে হবে যেন এইসব মানবিক সত্তা (হিউম্যান এসেন্স) আগে থেকেই সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির

অভ্যন্তরে সাধারণ অব্যক্ত 'জেনাস' হিসাবে নিহিত থাকে এবং এটাই স্বাভাবিক ভাবে বহু ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এর বিরুদ্ধতা করে মার্কস বলছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অ্যাবস্ট্র্যাকশনে বা বিমূর্ত রূপে মানবিক সত্তা নিহিত নয়, বাস্তবে এটা বিশেষ যুগের বিশেষ সামাজিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। মার্কস ফুয়েরবাক সম্পর্কে আরও বললেন যে, ''He does not see that the 'religious sentiment' is itself a social product. ...''[১৯] অর্থাৎ, একটা বিশেষ যুগে বিশেষ সমাজেই যে ধর্মীয় মনোভাব জন্ম নিয়েছিল, এটাও ফুয়েরবাক বুঝতে পারেননি। ফুয়েরবাক ঈশ্বরভিত্তিক রিলিজিয়ন বা ধর্মকে বর্জন করলেন, কিন্তু ধর্মের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, ল্যাটিন ভাষায় *religare* অর্থাৎ bond থেকে religion এসেছে। মানুষে মানুষে এই bond বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই religion হিসাবে চিরদিন থাকবে। সকল যুগে সকলের পক্ষে গ্রহণীয় একটি নৈতিকতাকে নতুন ধর্ম হিসাবে তিনি উপস্থিত করলেন। সেটা হচ্ছে, ''rational self-restraint with regard to ourselves and love– again and again love in our intercourse with others, ...''[২০] অর্থাৎ, সামাজিক সম্পদ গ্রহণের প্রশ্নে ব্যক্তির নিজের ক্ষেত্রে থাকবে 'যুক্তি সঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণ' আর অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে থাকবে ভালবাসা এবং পুনরায় ভালবাসা। অর্থাৎ, অন্যদের যতটুকু দেওয়া হবে, সেটা ভালবাসা হিসাবেই দেওয়া হবে। এই 'আমরা' ও 'অন্যেরা' কোন যুগের, কোন সমাজের কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সেটা তিনি দেখালেন না, যেন ব্যক্তি হল ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন বিমূর্ত সত্তা। এর বিরোধিতা করে মার্কস বললেন, ''the abstract individual whom he analyses belongs in reality to a particular form of society''[২১] অর্থাৎ, ফুয়েরবাক যে বিমূর্ত ব্যক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই ব্যক্তি বাস্তবে একটা বিশেষ ধরনের সমাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্ন হচ্ছে, ফুয়েরবাক নির্ধারিত এই 'যুক্তিসঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণ' ও 'ভালবাসা' মালিক ও শ্রমিক শ্রেণিতে বিভক্ত সমাজে কী দিয়ে নির্ধারিত হবে? তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী দাঁড়াবে 'যুক্তিসঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণ' বজায় রেখে মালিক মুনাফা অর্জন করবে এবং 'ভালবাসা' হিসাবে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করবে। ফলে বাস্তবে ফুয়েরবাক তাঁর অজ্ঞাতসারে সেই যুগের উদীয়মান পুঁজিবাদের স্বার্থে বুর্জোয়া পার্থিব মানবতাবাদের (secular humanism) প্রবর্তক হয়ে গেলেন, যেখানে শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের জন্য একই অধিকার, সংবিধান, আইনকানুন, ন্যায়নীতিবোধ চালু করা হল, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হল। এই মানবতাবাদী নৈতিকতার নির্মম পরিণতি কী ঘটছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তা

প্রতিদিন শোষিত জনগণ দুঃসহ যন্ত্রণায় অনুভব করছে। হেগেলের শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করে তিনি কার্যত এই বুর্জোয়া মানবতাবাদকেই শাশ্বত হিসাবে দাঁড় করালেন। তিনি বস্তুবাদ সম্পর্কে বললেন, ‘‘To me, materialism is the foundation of the edifice of human essence and knowledge; but to me it is not what...the edifice itself. Backwards I fully agree with the materialists, but not forwards.’’[২২] অর্থাৎ, তিনি বললেন, মানুষের জ্ঞান ও মানবিক সত্তার সৌধের ভিত্তি যে বস্তুবাদ, এ-পর্যন্ত তিনি বস্তুবাদীদের সাথে একমত, কিন্তু মানুষের চিন্তা, জ্ঞান, মানবিক সত্তা যে বস্তুবাদী— এ ক্ষেত্রে একমত নন। তাই বললেন, পেছনের দিকে আমি বস্তুবাদীদের সাথে একমত, কিন্তু সামনের দিকে নয়। তাঁর এই বক্তব্য দেখে মার্কসের সহযোদ্ধা এঙ্গেলস বললেন, ‘‘Inspite of the 'foundation', he remained here bound by the traditional idealist fetters.’’[২৩] অর্থাৎ, ফুয়েরবাক মানবিক সত্তা ও জ্ঞানের সৌধের ভিত্তি হিসাবে বস্তুবাদকে স্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি প্রচলিত ভাববাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে গেলেন। এইজন্যই এঙ্গেলস আরও বললেন, ‘‘The real idealism of Feuerbach becomes evident as soon as we come to his philosophy of religion and ethics.’’[২৪] অর্থাৎ, ফুয়েরবাকের ধর্ম ও নৈতিকতার দর্শন বিচার করলে তাঁর প্রকৃত ভাববাদী চিন্তা ধরা পড়ে।

ফুয়েরবাকের এই ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে, তিনি সত্যানুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। আরেকটি কারণ হচ্ছে, সমাজ যে শ্রেণি বিভক্ত এবং যতবড় সৎ ও প্রতিভাবানই হোক না কেন, যে কোনও ব্যক্তির চিন্তা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনও না কোনও শ্রেণির স্বার্থের প্রতিফলন হতে বাধ্য, এটাও তিনি ধরতে পারেননি। ফলে তাঁর অজ্ঞাতসারে তিনি উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণির চিন্তানায়ক হয়ে গেলেন। এইখানেই মার্কসের সাথে তাঁর মৌলিক পার্থক্য হয়ে গেল।

ফুয়েরবাক তাঁর মতবাদের ভিত্তি কোথায় অর্থাৎ কোন সমাজ ব্যবস্থায় কোন শ্রেণি স্বার্থে এই চিন্তা এসেছে এটা বুঝতে কীভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কীভাবে সেটা বোঝা সম্ভব ছিল, তা বোঝাতে গিয়ে মার্কস খুব সুন্দর ভাষায় বললেন, ‘‘... the secular foundation detaches itself from itself and establishes itself as an independent realm in the clouds which can only to be explained by the self-cleavage and

self-contradictions of this secular basis."[২৫] অর্থাৎ, মার্কস দেখাচ্ছেন, ফুয়েরবাক তাঁর প্রচারিত সেকুলার বা পার্থিব মানবতাবাদের পার্থিব ভিত্তি কী, তা দেখাতে ব্যর্থ হয়ে এটাকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন সত্তা হিসাবে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখলেন। তারপর মার্কস বলছেন, এই পার্থিব মানবতাবাদকে একমাত্র ব্যাখ্যা করা যায় তার পার্থিব ভিত্তির নিজস্ব-বিভেদ বা অন্তর্দ্বন্দ্বের উপলব্ধির মাধ্যমে। অর্থাৎ মার্কস দেখাচ্ছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই হচ্ছে ফুয়েরবাকের পার্থিব মানবতাবাদের ভিত্তি এবং এই ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই একমাত্র এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করা যায়, যেটা ফুয়েরবাক ধরতে পারেননি।

মানব ইতিহাসে মার্কসই সর্বাপেক্ষা উন্নত সমাজের রূপরেখা তুলে ধরেন

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞান প্রয়োগে মার্কস উন্নততর কমিউনিস্ট সমাজের রূপরেখা তুলে ধরেন— যে সমাজে শুধু ব্যক্তিমালিকানা, শ্রেণিবিভাগ, শ্রেণিশোষণ ও শ্রেণিশাসন বিলুপ্ত হবে তাই নয়, সাধারণ মানুষ এমন এক নৈতিক মান অর্জন করবে যেখানে ব্যক্তিস্বার্থের মানসিকতা, লোভ, ঈর্ষাপরায়ণতা ও অপরকে ঠকানোর মন ইত্যাদি সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে। প্রত্যেক মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার স্বাধীন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে যাবে, সকলেই খুশি মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শ্রম করবে নিছক নিজের জীবনধারণের স্বার্থে নয়, সমগ্র সমাজের সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনে। উৎপাদনের প্রাচুর্য ঘটবে এবং প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক উৎপাদিত সম্পদ পাবে। কমিউনিস্ট সমাজ নারী-পুরুষে প্রকৃত সমানাধিকার, বয়স্কদের সুস্থ ও নিরাপদ জীবন এবং শিশুদের সম্পূর্ণ বিকাশ সুনিশ্চিত করবে। জনগণের নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি কমিউনিস্ট সংস্কৃতির ভিত্তিতে এমন উন্নত স্তরে পৌঁছবে যে রাষ্ট্র, সরকার, আইনের শাসন ও দমনের হাতিয়ার ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়ে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে যে সমাজব্যবস্থার কথা ধর্মীয় প্রচারকরা ও বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা বাস্তবে সম্ভব বলে কল্পনাও করতে পারেননি, মার্কসবাদ দেখাল সেই সমাজ কমিউনিজমই প্রতিষ্ঠা করবে।

মহান এঙ্গেলসই প্রথম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে মার্কসবাদ বলে অভিহিত করেন

মার্কসের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদযাপনের এই সভায় আমি মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে যা শিখেছি তারই ভিত্তিতে মার্কসের কিছু অতি মূল্যবান অবদান আপনাদের কাছে রাখলাম। আবার এই প্রসঙ্গে আরেকজন মহান চিন্তানায়কের অবদানও সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই, তিনি হচ্ছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। তিনি সর্বক্ষেত্রে মার্কসের সুযোগ্য সহযোদ্ধাই ছিলেন তা নয়, তিনিও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগ করে মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হচ্ছে, 'ডায়ালেকটিকস অফ নেচার', 'অ্যান্টি ড্যুরিং', 'অরিজিন অফ ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড স্টেট', 'ফুয়েরবাক অ্যান্ড এন্ড অফ ক্লাসিক্যাল জার্মান ফিলোসফি', 'পার্ট প্লেড বাই লেবার ইন দি ট্রানজিশন ফ্রম এপ টু ম্যান' ইত্যাদি। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্বগতভাবে আয়ত্ত করতে হলে এই বইগুলি অবশ্যই পড়তে হবে। ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়ে মিলেই রচনা করেছেন। মার্কস তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এঙ্গেলসই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দিনের পর দিন কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে মার্কসের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও স্টাডি করে 'ক্যাপিটাল'-এর বাকি খণ্ডগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তা না হলে এই অমূল্য রত্নসম্পদ বিশ্ববাসীর অজানা থেকে যেত। তিনিই প্রথম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে মার্কসবাদ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর নাম বাদ দিয়ে শুধু মার্কসবাদ বলছেন কেন, এই প্রশ্ন করা হলে এঙ্গেলস যে উত্তর দিয়েছেন, সেটা শুধু তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় নয়, আমাদের সকলের কাছেই অসাধারণ দৃষ্টান্তমূলক ও শিক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, ''Here I may be permitted to make a personal explanation. Lately repeated reference has been made to my share in this theory, and so I can hardly avoid saying a few words here to settle this point. ...what I contributed– at any rate with the exception of my work in a few special fields– Marx could very well have done without me. What Marx accomplished I would not have achieved. Marx stood higher, saw farther, and took a wider and quicker view than all the rest of us. Marx was a genius; we others were at best talented. Without him the theory would not be by far what it is today. It therefore rightly bears his name.''[২৬] অর্থাৎ, তিনি বলছেন, 'এই প্রসঙ্গে

আমার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দেওয়ার অনুমতি চাইছি। সাম্প্রতিককালে এই তত্ত্বের (দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ) সৃষ্টির ক্ষেত্রে অংশীদার হিসাবে আমার ভূমিকা নিয়ে বারবার কথা আসছে, সুতরাং এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য কিছু কথা আমি এড়িয়ে যেতে পারি না। ...কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র বাদ দিলে আমার যা কিছু অবদান তা মার্কস আমাকে বাদ দিয়ে ভালভাবেই করতে পারতেন। কিন্তু মার্কস যে কাজ সম্পন্ন করেছেন, আমি সেটা পারতাম না। আমাদের সকলের তুলনায় মার্কস অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়েছিলেন, অনেক দূর দেখেছেন, অতিদ্রুত বিশাল ব্যাপ্তিময় ধারণা নিতে পেরেছেন। মার্কস ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর মনীষী (genius), আমরা বড়জোর সাধারণ মাপের প্রতিভার (talent) অধিকারী। আজ তত্ত্ব যে আকারে দেখা যাচ্ছে, মার্কসকে বাদ দিয়ে সেটা সম্ভব ছিল না। সুতরাং যথার্থভাবেই এই তত্ত্বের সাথে তাঁর নাম যুক্ত হয়েছে।' আপনারা জানেন, ১৮৮৩ সালে ১৪ মার্চ মানবসভ্যতার মহান সন্তান কার্ল মার্কস শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৭ মার্চ তাঁর সমাধিস্থানে শোকসভায় কী গভীর শ্রদ্ধায় ও আবেগে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বলেছিলেন, "...বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত চিন্তাবিদের চিন্তাশক্তি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল। ...তাঁর জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী সমাজ ও সেই সমাজ যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, সব কিছুর উচ্ছেদের পথ প্রদর্শন করা, আধুনিক কালের সর্বহারা শ্রেণিকে তার অবস্থা, প্রয়োজন ও মুক্তি সম্পর্কে সচেতন করা এবং তার মুক্তিসংগ্রামের পথ নির্ণয় করা। ...যুগে যুগে তাঁর নাম ও অমূল্য সৃষ্টি স্থায়ী হয়ে থাকবে।"[২৭] মার্কস ও এঙ্গেলসের এই অতুলনীয় গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিষয়ে লেনিন কী বলেছিলেন, সেটা আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। লেনিন বলেছেন, "পুরাকথায় বন্ধুত্বের অনেক মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্তের কাহিনি শোনা যায়। ইউরোপীয় প্রলেটারিয়েট একথা বলতে পারে যে তাদের বিজ্ঞান গড়ে দিয়ে গেছেন এমন দুই মনীষী ও যোদ্ধা, যাঁদের সম্পর্ক মানবিক বন্ধুত্বের সর্বাধিক মর্মস্পর্শী সমস্ত প্রাচীন কাহিনিকেও ছাড়িয়ে যায়। এঙ্গেলস সর্বদাই এবং মোটের উপর সঙ্গতভাবেই— নিজেকে রেখেছেন মার্কসের পিছনে। এক পুরনো বন্ধুর কাছে তিনি লেখেন, 'মার্কস জীবিত থাকাকালে আমি দোহারের কাজ করেছি।' জীবিত মার্কসের প্রতি ভালবাসার এবং মৃতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার সীমা ছিল না তাঁর।"[২৮]

মার্কসবাদকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন লেনিন

আপনারা অনেকেই জানেন, মার্কসই ১৮৬৪ সালে এঙ্গেলসের সহযোগিতায় বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংগঠন 'দি ইন্টারন্যাশনাল

ওয়ার্কিংমেন'স অ্যাসোসিয়েশন' যেটা প্রথম আন্তর্জাতিক বলে পরিচিত, তা প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ১৮৭২ সাল পর্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। পরে বিপথগামী হয়ে যাওয়ায় ১৮৮৯ সালে এঙ্গেলসের উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এঙ্গেলসের জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত মার্কসবাদের পতাকা সার্থকভাবে বহন করেছিল। লেনিন এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামী হিসাবে রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (আরএসডিএলপি)-তে যোগ দেন। কিন্তু কিছুদিন পর বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে নানা গুরুত্বপূর্ণ আদর্শগত প্রশ্নে লেনিনের সাথে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের গুরুতর মতভেদ দেখা দেয় এবং তিনি আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে প্রমাণ করেন যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের নামে সংশোধনবাদের চর্চা করছে। সেই সময় একদিকে বুর্জোয়া চিন্তাবিদদের মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ, অন্যদিকে সংশোধনবাদীদের মার্কসবাদকে বিকৃত করার অপচেষ্টা— এই উভয়ের বিরুদ্ধেই লেনিনকে লড়তে হয়েছে। তাছাড়া পুঁজিবাদ যে নতুন স্তর অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে, যে স্তর মার্কস-এঙ্গেলস দেখে যাননি, এই সাম্রাজ্যবাদী স্তরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী কী, এই স্তরে মার্কসবাদের প্রয়োগ কী ভাবে হবে, দেশে দেশে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল কী পদ্ধতিতে গড়ে উঠবে, গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ কী, সর্বহারা বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল কী হবে— এইসব প্রশ্নেও লেনিনকে আলোকপাত করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেনিনের একটি বিখ্যাত উক্তি আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন, "We do not regard Marxist theory as something completed and inviolable; on the contrary, we are convinced that it has only laid the corner-stone of the science which Socialists must further advance in all directions if they wish to keep pace with life. We think that an independent elaboration of the marxist theory is especially essential for Russian socialists, for this theory provides only general guiding principles, which in particular, are applied in England differently from France, in France differently from Germany, and in Germany differently from Russia."[২৯] অর্থাৎ, লেনিন বলছেন, "আমরা মার্কসবাদী তত্ত্বকে সম্পূর্ণ ও অলংঘনীয় বলে মনে করি না, বরং আমরা মনে করি এই তত্ত্ব এমন বিজ্ঞানের ভিত্তিই স্থাপন করে গেছে, যাকে সমাজতন্ত্রীদের গতিশীল জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হলে সর্বদিক থেকে অবশ্যই

এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা মনে করি, রাশিয়ার সোসালিস্টদের জন্য বিশেষভাবে এই মার্কসবাদী তত্ত্বের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইলাবোরেশান দরকার, কারণ এই তত্ত্ব কেবলমাত্র সাধারণভাবে গাইডিং প্রিন্সিপ্যালস নির্ধারণ করেছে, যেটা ফ্রান্স থেকে আলাদাভাবে ইংল্যাণ্ডে, জার্মানি থেকে আদালাভাবে ফ্রান্সে এবং রাশিয়া থেকে আলাদাভাবে জার্মানিতে বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হবে।" মার্কসবাদের নামে যেসব ডগম্যাটিস্ট বা গোঁড়াপন্থীরা মার্কসের প্রতিটি বাক্য ও শব্দকে অলংঘনীয় সত্য বলে গণ্য করছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে লেনিনকে এই কথা বলতে হয়েছে যে মার্কসবাদ একটা বিকাশশীল বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে হবে। মার্কসবাদের জেনারেল গাইড লাইন বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এভাবেই মার্কসবাদেরও অগ্রগতি ঘটবে। ফলে, মার্কস-এঙ্গেলস পরবর্তী যুগে লেনিন দর্শনগত, তত্ত্বগত, রাজনীতি ও অর্থনীতিগত, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত, সর্বহারা বিপ্লবী দলের সংগঠনগত এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে রণনীতি ও রণকৌশল ইত্যাদি নানা প্রশ্নে মার্কসবাদকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে নতুন স্তরে উন্নীত করেছেন, যে জন্য তাঁর ছাত্র মহান স্ট্যালিন সঠিকভাবেই বলেছেন, "Leninism is Marxism in the era of imperialism and proletarian revolution."[৩০] অর্থাৎ, লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। এই নতুন যুগের নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন সমস্যার ও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে মার্কসবাদকে যথার্থ উপলব্ধি ও প্রয়োগ করতে হলে লেনিনের শিক্ষাগুলিকে বুঝতে হবে। লেনিনের পর তাঁর ছাত্র হিসাবে পর পর স্ট্যালিন, মাও সে-তুং ও শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আরও বিকশিত ও উন্নত করেছেন।

আপনারা জানেন মার্কসবাদকে সফলভাবে প্রয়োগ করে ১৯১৭ সালের নভেম্বরে লেনিন রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে মানব ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিশোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিপ্লবের সময়ে ইউরোপের মধ্যে রাশিয়া শিল্পে খুবই অনুন্নত অবস্থায় ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত সেই দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল, দেশের মধ্যে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীরা গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছিল, আর সেই সময়ে সদ্যোজাত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার জন্য চতুর্দিক ঘিরে সাম্রাজ্যবাদীরা অঘোষিত আক্রমণ চালিয়েছিল, একই সাথে অর্থনৈতিক অবরোধও করেছিল। এই অবস্থায় লেনিনের নেতৃত্বে স্ট্যালিন ও অন্য নেতারা, সমগ্র বলশেভিক পার্টি,

রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক জনগণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করে। উল্লেখযোগ্য হল, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণিও সোভিয়েত বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়ায়। বিপ্লবের পর লেনিন কার্যত ৬ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যথেষ্ট অনুন্নত ছিল এবং তীব্র অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। অন্যদিকে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন উপদলীয় চক্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করে এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আঘাত করার জন্য নানা আদর্শগত বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করে এবং এমনকী বিদেশি শত্রুরাষ্ট্রের সাথে যোগসাজশও করে। এই পরিস্থিতিতে লেনিনের সুযোগ্য উত্তরসাধক হিসাবে স্ট্যালিন একদিকে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে এই উপদলীয় চক্রকে বিচ্ছিন্ন করে, অন্যদিকে ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সংগ্রাম চালিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, এককথায় মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে অতি দ্রুত অগ্রগতি সাধন করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করেন। পশ্চিম দিগন্তে যখন বুর্জোয়া গণতন্ত্র সর্বাত্মক সংকটে নিমজ্জিত হয়ে মানব সভ্যতাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিল, তখন পূর্ব দিগন্তে এই সর্বহারা গণতন্ত্রের সূর্যোদয় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আশা-ভরসায় ও আনন্দে অভিভূত করেছিল। ইউরোপের রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন প্রমুখ, আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, সুব্রমণিয়াম ভারতী, নজরুল এবং সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং সহ সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীই এই সমাজতান্ত্রিক সভ্যতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। এই সোভিয়েত সমাজতন্ত্র দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামগুলিকে, মুক্তিসংগ্রামগুলিকে সর্বাত্মক সাহায্য দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইটালি ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণে যখন মানব সভ্যতা বিপন্ন, তখন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরত্বপূর্ণ লড়াই যে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, সেটা ঘোরতর সোভিয়েত বিরোধীরাও সেদিন স্বীকার করেছিলেন। এটাও সর্বজনস্বীকৃত ছিল যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তিরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে কাজ করেছিল। এছাড়াও আপনারা জানেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ থেকে মুক্ত করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। অন্যদিকে দীর্ঘ দিন অক্লান্ত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনেও বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের এই ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি, সাম্যবাদী আদর্শের মর্যাদা বৃদ্ধি, উপনিবেশগুলিতে সোভিয়েত সাহায্যপুষ্ট মুক্তিসংগ্রামের জোয়ার সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতিদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু খুবই বেদনার বিষয় বিশ্ববিপ্লবের পক্ষে এইরকম অনুকূল পরিস্থিতিতে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে ও মাও সে-তুংয়ের মৃত্যুর পর চীনে সংশোধনবাদী আক্রমণে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবের পথে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুঃখজনক ঘটনায় মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি না থাকায় অনেকেই যেমন হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন, আবার এই সুযোগে বুর্জোয়ারাও তারস্বরে প্রচার করছে, মার্কসবাদ ব্যর্থ, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু একথা কি ঠিক?

সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদী শক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসই হুঁশিয়ারি দেন

আমি মার্কসের কয়েকটি ঐতিহাসিক উক্তি দিয়েই আপনাদের দেখাব যে মার্কস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না দেখে যাওয়া সত্ত্বেও সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তরে বা সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদী শক্তি কীভাবে ক্রিয়া করে সে সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, ''What we have to deal with here is a communist society, not as it has developed on its own foundation, but, on the contrary, just as it emerges from capitalist society, which is thus in every respect, economically, morally and intellectually, still stamped with the birthmarks of the old society from whose womb it emerges.''[৩১] অর্থাৎ, তিনি বলছেন, "এই কমিউনিস্ট সমাজকে (সমাজতন্ত্র) বুঝতে হবে যে, এই সমাজ নিজস্ব ভিত্তি থেকে গড়ে ওঠেনি, বরং বিপরীতভাবে পুঁজিবাদী সমাজ থেকেই এর (সমাজতন্ত্র) অভ্যুত্থান ঘটেছে, যার ফলে যে পুরাতন সমাজের (পুঁজিবাদের) গর্ভ থেকে এই সমাজ জন্ম নিয়েছে, সেই সমাজের অর্থনৈতিক, নৈতিক, বুদ্ধিগত প্রতিটি ক্ষেত্রে জঠরচিহ্ন বহন করছে।" মার্কসের এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজস্ব ভিত্তি থেকে বিকশিত হয়নি, সে জন্ম নিয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে এবং তার ফলে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক, নৈতিক, চিন্তাগত প্রভাব বহন করে। যার ফলে এমনকী রাশিয়ার সমাজতন্ত্র যখন খুবই উন্নত স্তরের তখনও কমোডিটি সার্কুলেশন, ল অফ ভ্যালু, মজুরির পার্থক্য, স্টেট ফার্মিং-এর পাশাপাশি কালেকটিভ ফার্মিং (যেখানে জমি ও উৎপাদন যন্ত্রের মালিক রাষ্ট্র হলেও ফসলের মালিকানা চাষির ছিল), ব্যক্তির

অর্থ সঞ্চয়, ব্যক্তিমালিকানায় পোলট্রি ও অ্যানিমেল হাসব্যান্ড্রি ইত্যাদি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তাছাড়া অধিকাংশ জনগণ যারা মার্কসবাদী ছিল না, তাদের মধ্যে বুর্জোয়া চিন্তার ও অভ্যাসের ব্যাপক প্রভাব ছিল, অনুন্নত মানের কমিউনিস্টদের মধ্যেও এই প্রভাব ছিল। মার্কস এই বিপদটাই দেখিয়েছেন।

তিনি আরও বলেছেন, ''In a higher phase of communist society, after the enslaving subordination of the individual to the division of labour, and therewith also the anti-thesis between mental and physical labour, has vanished, after labour has become not only a livelihood but life's prime want, after the productive forces have also increased with the all-around development of the individual, and all springs of co-operative wealth flow more abundantly– only then can the narrow horizon of bourgeois right be crossed in its entirety and society inscribe on its banner : From each according to its ability, to each according to his needs.''[৩২] অর্থাৎ, তিনি বলছেন, "যখন শ্রমবিভাগের দাসত্ব থেকে ব্যক্তির মুক্তি ঘটবে এবং তার সাথে মানসিক ও কায়িক শ্রমের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের অবসান হবে, যখন শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য শ্রম নয়, শ্রমই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে, যখন ব্যক্তির সর্বাত্মক বিকাশের দ্বারা উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি ঘটবে এবং সমবায় সম্পদের সকল প্রবাহগুলি পর্যাপ্ত স্রোত বইয়ে দেবে, একমাত্র তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তকে সম্পূর্ণ পেছনে ফেলে রেখে উন্নত কমিউনিস্ট সমাজ তার পতাকায় খোদিত করবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রম দেবে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ পাবে।" এক কথায় মার্কসের এই ঐতিহাসিক বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় যতক্ষণ উপরোক্ত বিষয়গুলির (যেগুলি পুঁজিবাদী সমাজেরই বৈশিষ্ট্য) অবসান না ঘটানো যাচ্ছে, ব্যক্তির স্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করিয়ে শ্রমকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য না করা যাচ্ছে, কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে সংঘাত অবসান না করা যাচ্ছে এবং উৎপাদন শক্তির ব্যাপক বিকাশ ঘটিয়ে পর্যাপ্ত সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ পুঁজিবাদী অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা যাবে না, সমাজতন্ত্রের পর্যায় অতিক্রম করে কমিউনিস্ট সমাজ গঠন করা যাবে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইসব পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটিয়েই উন্নত

পর্যায়ের কমিউনিজমে পৌঁছানো যাবে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ব্যাপক অগ্রগতি সত্ত্বেও মার্কসীয় এই বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যের কত প্রভাব ছিল আপনারা ভেবে দেখুন। এটাও স্বাভাবিক যে উন্নত সাম্যবাদী সমাজে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই প্রভাবগুলি থাকবেই।

এছাড়াও তিনি বলেছেন, ''Between capitalist and communist society lies the period of the revolutionary transformation of the one into the other. There corresponds to this is also a political transition period in which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the proletariat.''[৩৩] অর্থাৎ, ''পুঁজিবাদী সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজের মাঝখানে একটা পর্ব থাকবে যখন একটার অপরটায় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটবে। এরই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে একটা রাজনৈতিক উত্তরণ পর্ব থাকবে, যেখানে রাষ্ট্র সর্বহারার বৈপ্লবিক একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।'' তাহলে মার্কসের এই বক্তব্যেও পরিষ্কার, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মাঝখানের স্তর (সমাজতন্ত্র) হচ্ছে ট্রানজিশনাল যেখানে একটা আরেকটায় বৈপ্লবিক রূপান্তরিত হতে পারে। অর্থাৎ মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগ হলে সমাজতন্ত্র কমিউনিজমের দিকে এগোবে, আর মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী হলে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রবর্তন হবে।

সমাজতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা সকল মার্কসবাদী চিন্তানায়কই বলেছেন

তাহলে এবার দেখুন, মার্কস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্ভূত সমস্যাগুলি না দেখেও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে কত আগে সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা ব্যক্ত করে গেছেন। একইভাবে মার্কসের পর লেনিন এবং তারপর ক্রমান্বয়ে স্ট্যালিন, মাও সে-তুং ও শিবদাস ঘোষ নানা দিক থেকে সমাজতন্ত্রে কী কী কারণে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লব ঘটতে পারে এই সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেছেন। তাঁদের এইসব বক্তব্য আপনারা ইতিপূর্বে আমাদের দলের অন্য নেতাদের কাছ থেকে এবং আমার কাছ থেকে শুনেছেন। ফলে আজ আর আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাইছি না। ফলে এটা প্রমাণিত, মার্কস থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল মার্কসবাদী চিন্তানায়কেরা কেউই দাবি করেননি যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে

গেলে আর পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নেই, বরং তাঁরা উল্টো কথাই বলে গেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতো সমাজতন্ত্রেও শ্রেণিসংগ্রাম চলতে থাকে, বরং আরও তীব্র হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন শত্রুপক্ষ প্রকাশ্যে থাকে, সচেতন শ্রমিক শ্রেণি ও ভ্যানগার্ড কমিউনিস্ট দল বৈপ্লবিক সংগ্রামী ভূমিকা নেয়, অশেষ ত্যাগ স্বীকার করে পুঁজিবাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার লড়াই চালাতে থাকে। কিন্তু ক্ষমতা দখল এবং সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পর উপযুক্ত চেতনার অভাবে বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণি ও কমিউনিস্ট দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি ও শৈথিল্য দেখা দিতে পারে, পুরনো বুর্জোয়া সমাজের মানসিকতা-সংস্কৃতি ও অভ্যাসের প্রভাব মাথাচাড়া দিতে পারে, তারই সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া শক্তি অতি সংগোপনে প্রতিবিপ্লবের চক্রান্ত চালাতে থাকে এবং অনেক সময় 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ' করতে করতেই এই ষড়যন্ত্র চালায়। মার্কসবাদী চিন্তানায়কেরা এইসব বিষয়ে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও স্ট্যালিন ও মাও সে-তুং পরবর্তী নেতারা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে সংশোধনবাদের শিকার হয়ে ও বিপথগামী হয়ে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। এই মর্মান্তিক পরিণতি অনিবার্য ছিল না, যদি স্ট্যালিন-মাও সে-তুং পরবর্তী স্তরে সঠিকভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে শ্রেণি সংগ্রাম পরিচালনা করা হত। ফলে এটাকে কোনও মতেই মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা বলা চলে না। বরং মার্কস থেকে শুরু করে পরবর্তী মার্কসবাদী চিন্তানায়কেরা সঠিকভাবেই এই সম্ভাবনার আশঙ্কা ব্যক্ত করে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার সংগ্রামের সঠিক দিকই নির্ণয় করে গেছেন।

আবার এ কথাও বুঝতে হবে ইতিপূর্বে ইতিহাসে যে সব ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছিল, সেইসব ধর্মপ্রচারক নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান দাবি করা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মকে চূড়ান্ত জয়ের জন্য পরাজয়-জয়-পরাজয়ের পথে কয়েক শত বৎসর লড়তে হয়েছিল, রেনেসাঁস থেকে শুরু করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে একইভাবে প্রায় ৩৫০ বছর লড়াই চালাতে হয়েছে। এগুলি কোনওটাই শ্রেণিশোষণ উচ্ছেদের লড়াই ছিল না, বরং তা এক শ্রেণির শোষণের পরিবর্তে অন্য শ্রেণির শোষণ এনেছে। আর সমাজতন্ত্রকে লড়তে হয়েছে দাসপ্রথা থেকে শুরু করে সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ— এই কয়েক হাজার বছরের শ্রেণিশোষণ ও ব্যক্তি-মালিকানা উচ্ছেদের জন্য, সেখানে ৭০/৮০ বছরের সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বের শক্তি কতটুকু? তবুও যতদিন লেনিন-স্ট্যালিন ও মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র বীর কদমে এগোচ্ছিল, ততদিন মানব ইতিহাসে প্রমাণ করা গেছে

শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে এই নতুন মহান সভ্যতা কী অসাধ্যসাধন করতে পারে।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় শিক্ষা রেখে গেল

ফলে সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয়ে হতাশার কোনও কারণ নেই। হতাশা আসে মিথ্যা ও কাল্পনিক আশা থেকে, চেতনার অনুন্নত মান থেকে। মার্কসবাদীদের আশা ও বিশ্বাসের উৎস বিজ্ঞান, ইতিহাস ও মানবতা— যেখানে লড়াইয়ে পরাজয় আছে, জয় আছে, আবার পরাজয় আছে, পুনরায় জয় এবং তা সবই কার্য-কারণের নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত। ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে শ্রমিক শ্রেণি পুঁজিপতিদের পরাস্ত করে প্যারি কমিউন গঠন করেছিল, তিন মাস শাসন চালিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াদের আক্রমণে পরাস্ত হয়, হাজার হাজার শ্রমিককে বুর্জোয়ারা বিনা বিচারে নৃশংসভাবে খুন করে, প্যারিসের রাস্তা রক্তাক্ত হয়ে যায়। বধ্যভূমিতে যখন একদলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সেই বীর বিপ্লবী শ্রমিকদেরই একজন মহান আন্তর্জাতিক সঙ্গীত রচনা করেন, সেই সঙ্গীত সব দেশেরই বিপ্লবে, মুক্তি সংগ্রামে ও গণআন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছে ও জোগাচ্ছে। মার্কস তখন জীবিত ছিলেন, তিনি এই প্যারি কমিউনের পতন থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণিকে বলেন, "...one thing especially was proved by the commune, viz., that 'the working class cannot simply lay hold of the ready-made state machinery and wield it for its own purposes..."[৩৪] অর্থাৎ, শ্রমিক শ্রেণি বুর্জোয়াদের পরাস্ত করলেও বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিঁকিয়ে রেখে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না। ফলে, নিছক রাষ্ট্রদখল নয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। লেনিন এই শিক্ষাকে রাশিয়ায় বিপ্লবে প্রয়োগ করেছিলেন। তেমনই আজকের মার্কসবাদীদেরও রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপের এই বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে যেকোনও দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছনো না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু অর্থনৈতিক কাঠামোতেই নয়, উপরকাঠামোতেও অর্থাৎ চিন্তা-সংস্কৃতি-অভ্যাস-আচরণ সর্বক্ষেত্রে সচেতনভাবে ক্ষমতাচ্যুত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম চালাতে হবে।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, আজ সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে কী দুর্বিষহ সংকট সৃষ্টি করেছে। সর্বত্র শোষিত সমাজ পরিত্রাণ চাইছে, পরিবর্তন চাইছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে এবং আমাদের দেশেও প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক বিক্ষোভ হচ্ছে, গণবিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠছে। কিন্তু সঠিক পথ জানা নেই, উপযুক্ত নেতৃত্ব নেই। এই নেতৃত্ব দিতে পারে, পথ দেখাতে পারে একমাত্র মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বলীয়ান শক্তিশালী যথার্থ বিপ্লবী দল। মার্কস যাদের বলেছেন, 'grave-diggers of capitalism', পুঁজিবাদের কবর খননকারী সেই শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবী রাজনীতি ও উন্নত নৈতিকতার আধারে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করতে হবে।

দুঃসহ দারিদ্রের মধ্যেই মার্কস তাঁর সাধনা চালিয়েছিলেন

এখন, কী নিদারুণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানব সভ্যতার এই মহৎ সন্তান কার্ল মার্কসকে জ্ঞানের সাধনা করতে হয়েছে, সেই সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আপনাদের কাছে রাখতে চাই, যা সর্বদেশে সর্বকালে বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এটা আপনারা অনেকেই জানেন, তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকার জন্য দীর্ঘদিন ধরে জার্মানি থেকে ফ্রান্সে, ফ্রান্স থেকে বেলজিয়ামে, আবার ফ্রান্সে— বারবার এভাবে তাঁকে নির্বাসিত হয়ে থাকতে হয়েছে এবং সর্বশেষে লন্ডনে আশ্রয় নেন। এই দিনগুলি কীভাবে কেটেছিল, অনেকেই জানেন না। আমিও জেনেছি লেনিনের লেখা ও মার্কসের স্ত্রী জেনি মার্কসের লেখা থেকে। তাঁদের লেখার সংক্ষিপ্ত কয়েকটি অংশ এখানে পড়ে শোনাব। শুনলে আপনারা চোখের জল সংবরণ করতে পারবেন না।

লেনিন লিখছেন, "...মার্কসের নির্বাসিত জীবন অত্যন্ত কষ্টে কাটে। ...অভাব অনটনে মার্কস ও তাঁর পরিবার একেবারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এঙ্গেলসের নিরন্তর ও আত্মোৎসর্গী অর্থসাহায্য না পেলে মার্কসের পক্ষে 'পুঁজি' বইখানি শেষ করা দূরের কথা, অভাবের তাড়নায় তিনি নিশ্চয়ই মারা পড়তেন...।"[৩৫]

এবার শুনুন মার্কসের জীবনের সেই দিনগুলির কথা কী গভীর বেদনায় ও মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর সংগ্রামী জীবনের সুযোগ্য সহযোদ্ধা ও স্ত্রী জেনি মার্কস তাঁর বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিতে। এই চিঠি দু'টির কিছু অংশ আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি লিখছেন, "১৮৪৫ সালের গোড়ায় হঠাৎ একদিন পুলিশ কমিশনার আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। প্রুশিয়ান সরকারের অনুরোধে গিজোর জারি করা ফ্রান্স থেকে আমাদের বহিষ্কারের একখানা হুকুমনামা তিনি আমাদের দেখালেন। তাতে লেখা, 'কার্ল মার্কসকে

২৪ ঘন্টার মধ্যে প্যারিস ছেড়ে চলে যেতে হবে।' আমাকে অবশ্য আরেকটু বেশি সময় দেওয়া হয়েছিল। আমাদের আসবাবপত্র ও আমার কিছু কিছু রেশমি চাদর ও কাপড়চোপড় বিক্রির কাজে এই বাড়তি সময়টার সদ্ব্যবহার করলাম। তার জন্যে অবশ্য জলের দরে সবকিছু বিক্রি করতে হল।"

"...গভীর রাত্রে একদিন জনা দুই লোক দুমদাম করে আমাদের বাড়িতে পৌঁছল। কার্লের খোঁজ করছিল তারা। কার্ল দেখা দিতে তারা বলল যে তারা পুলিশের সার্জেন্ট এবং তাদের কাছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে ও জেরার জন্যে কার্লকে তারা নিয়ে যেতে চায়। কার্লকে নিয়েও গেল তারা। সাংঘাতিক উদ্বেগ নিয়ে ওর পিছু-পিছু আমিও বেরিয়ে পড়লাম এবং ব্যাপারটা কী জানার জন্যে প্রভাবশালী লোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলাম। অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে লাগলাম আমি। ওই অবস্থায় হঠাৎ একজন রক্ষীর খপ্পরে পড়ে গেলাম। সে আমাকে গ্রেপ্তার করে অন্ধকার একটা হাজতে পুরে দিল। হাজতটা ছিল নিরাশ্রয় ভিখারি, বংশপরিচয়হীন আর রাস্তার নষ্টচরিত্র মেয়েদের আটক করার জন্যে। যাই হোক, ঘুটঘুটে অন্ধকার একটা খুপরিতে আমাকে তো পুরে দেওয়া হল। বুকচাপা গুমরানো কান্না নিয়ে খুপরিতে ঢোকার পর আমার দুর্দশার সঙ্গী একটি দুঃখী মেয়ে আমার সঙ্গে তার শোবার জায়গাটা ভাগাভাগি করে নিতে চাইল। জায়গাটা ছিল শক্ত কাঠের তক্তার বিছানা। কী আর করা, তার উপর শুয়ে পড়লাম। যখন সকাল হল তখন আমার জানলার উল্টো দিকের জানলায় লোহার গরাদের ওধারে একটা ফ্যাকাসে, শোকার্ত মুখ দেখতে পেলাম। জানলার কাছে গিয়ে চিনতে পারলাম লোকটি আর কেউ নয় অমাদের পুরনো বন্ধু জিগো। আমায় দেখতে পেয়ে উনি ইশারা করে নিচের দিকে দেখতে বললেন। নিচে তাকিয়ে দেখি, কার্লকে ফৌজি পাহারায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এক ঘন্টা পরে জেরার জন্য আমাকেও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হল।

ঘন্টা দুই ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর আমার পেট থেকে বিশেষ কোনও কথা বের করতে না পেরে জনৈক পাহারাওলা একখানা গাড়ির কাছে আমাকে নিয়ে গেল। একেবারে সন্ধের দিকে অসহায় তিনটি দুধের বাচ্চাকে আবার বুকের কাছে পেলাম আমি।"

"...১৮৪৯ সালের জুলাই মাসে আমিও তার পিছু পিছু প্যারিসে গিয়ে হাজির হলাম এবং সেখানে মাসখানেক থাকলাম। কিন্তু সেখানেও আমাদের কপালে শান্তি ছিল না। একদিন জনৈক পুলিশ সার্জেন্ট আবার এল এবং আমাদের জানিয়ে দিল যে 'কার্ল মার্কস এবং তাঁর স্ত্রীকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে

প্যারিস ছেড়ে যেতে হবে'। কেবল নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে মোরাবিয়ানের অন্তর্গত ভান-এ কার্লকে থাকার অনুমতি দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, এ ধরনের নির্বাসনের সাজা গ্রহণ করতে রাজি হলাম না আমরা। ফলে একটা নিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে লন্ডন যাত্রা করার জন্যে আমি আবার যাবতীয় অস্থাবর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম।"

"...১৮৫০ সালের বসন্তকালে চেলসিয়ার বাসা আমরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। আমার কোলের খোকা বেচারা ফক্স প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছিল তখন এবং দৈনন্দিন জীবন কীভাবে চলবে এই দুশ্চিন্তায় আমারও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। চারিদিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে ও পাওনাদারদের উৎপাতে অস্থির হয়ে লিস্টার স্কোয়ারের এক জার্মান হোটেলে সপ্তাহখানেক কাটালাম। কিন্তু সেখানেও বেশি দিন থাকা গেল না। একদিন সকালে আমাদের সদাশয় হোটেল-মালিক প্রাতরাশ দিতে অস্বীকার করে বসলেন, ফলে আমরা বাধ্য হলাম অন্য বাসস্থান খুঁজে নিতে।"

"...আমাকে দেখে বাচ্চা এডগার তার প্রসন্ন মুখখানি নিয়ে ঝাঁপিয়ে কোলে এল আর বাচ্চা ফক্স ছোট্ট-ছোট্ট হাত দুখানি বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। কিন্তু ফক্সের আদর খাওয়া বেশিদিন আমার কপালে ছিল না। ওই বছর নভেম্বর মাসে নিউমোনিয়াজনিত মাংসপেশির খিঁচুনির দরুন বাচ্চাটা মারা গেল। সাংঘাতিক শোক পেলাম আমি। সে-ই আমার প্রথম সন্তানশোক। তখন আমার ধারণা ছিল না যে কপালে আরও এমন অনেক দুঃখকষ্ট লেখা আছে যার তুলনায় সেকালের ওই সব দুঃখশোক তুচ্ছ হয়ে যাবে।"

"...১৮৫২ সালের ঈস্টার পরবের সময় আমাদের মেয়ে ফ্রান্সিস্কার গুরুতর ব্রঙ্কাইটিস হল। তিনদিন ধরে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রইল সে। সাংঘাতিক কষ্টভোগ করেছিল মেয়েটা। যখন সে মারা গেল আমরা তার প্রাণহীন ছোট্ট দেহটা পিছনের ঘরে রেখে সামনের ঘরে গিয়ে মেঝেয় বিছানা পেতে শুলাম। আমাদের তিনটি জীবিত ছেলেমেয়ে আমাদের পাশে শুল আর যার বিবর্ণ, প্রাণহীন দেহ পাশের ঘরে পড়েছিল আমাদের সেই ছোট্ট সোনামণিটার জন্যে প্রাণভরে কাঁদলাম সবাই। আমাদের প্রিয় সন্তানের মৃত্যু ঘটল তখন যখন আমাদের কঠিনতম দুর্দশার সময় চলেছে আর আমাদের জার্মান বন্ধুরাও যখন সাহায্য করতে অসমর্থ হয়েছেন। ...একজন ফরাসি শরণার্থী প্রায়ই এই সময়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, আমাদের বাসা থেকে তিনি বেশি দূরেও থাকতেন না। হৃদয়বেদনায় অস্থির হয়ে ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং আমাদের সেই সাংঘাতিক প্রয়োজনের

মুহূর্তে তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই পাউন্ড দিলেন আমায় এবং অত্যন্ত বন্ধুসুলভ আচরণ করলেন ও সহানুভূতি জানালেন। কফিন কেনার জন্যে টাকাটা খরচ করা হল। এই কফিনে আমার মেয়ে এখন শান্তিতে শায়িত। মেয়ে আমার যখন পৃথিবীতে এসেছিল তখন তার একটা দোলনা পর্যন্ত ছিল না আর মারা যাওয়ার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত তার শেষ বিশ্রামের শয্যাটুকুও জুটছিল না।"

"...৬ জুলাই আমাদের সপ্তম সন্তান জন্ম নিল, কিন্তু পৃথিবীর হাওয়ায় অল্প কিছুক্ষণ নিশ্বাস নেওয়ার সময়টুকুই সে বেঁচেছিল। তারপর তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল চিরবিশ্রামে তার অন্য ভাইবোনদের সঙ্গী হতে।..."[৩৬]

"...তবে পরিস্থিতির চাপে হাতে কলম তুলে নিতে আজ আমি বাধ্য হয়েছি। আমার সানুনয় অনুরোধ, Revue থেকে কার্লের প্রাপ্য কিছু পারিশ্রমিক পেয়ে থাকলে কিংবা ভবিষ্যতে পেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা যেন আমাদের পাঠিয়ে দেন। টাকাটা আমাদের ভীষণ, ভী-ষ-ণ দরকার। যে ত্যাগস্বীকার আমাদের করতে হচ্ছে এবং বছরের পর বছর যা আমরা করে চলেছি তা বাড়াবাড়ি রকম জাহির করার ব্যাপারে অবশ্যই কেউ আমাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন না। আমাদের অবস্থার কথা জনসাধারণ কখনই বা কিছুই জানতে পারেননি। আমার স্বামী এসব ব্যাপারে বড়ই স্পর্শকাতর, তিনি বরং তাঁর শেষ সম্বলটুকুও ত্যাগ করবেন তবু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত 'মহৎ ব্যক্তিদের' মতো গণতান্ত্রিক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবেন না। ..."

"... অথচ তখন তাঁকে দেশ থেকে বলপ্রয়োগে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে। আপনি তো জানেন, নিজেদের বলতে আমরা কিছুই রাখিনি তখন। শেষসম্বল বলতে আমাদের যা ছিল সেই রূপোর জিনিসপত্র বন্ধক রাখতে আমি তখন ফ্রাঙ্কফুর্টে গেছি এবং কলোনে আমার আসবাবপত্র বিক্রি করে দিয়েছি। এসব না করলে সবকিছু খোয়ানোর ভয় ছিল। প্রতিবিপ্লবের দুঃসময় শুরু হওয়ার মুখে আমার স্বামী প্যারিসে গেলেন, তিনটি বাচ্চা নিয়ে তাঁর পিছু পিছু আমিও সেখানে গেলাম। প্যারিসে স্থিত হয়ে বসতে না বসতে সেখান থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল এবং এমনকী বাচ্চাদের আর আমাকেও একটা দিন বেশি থাকতে দেওয়া হল না।"

"...আমাদের ওই জীবনের কেবলমাত্র একটি দিনের বর্ণনা এখানে আমি দেব, দিনগুলো যেমনভাবে কাটত হুবহু সেইভাবে। এ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে সম্ভবত খুব কম শরণার্থীকেই আমাদের মতো অমন জীবন কাটাতে হয়েছে। বাচ্চাকে বুকের দুধ দেওয়ার মতো ধাই রাখা এখানে অত্যন্ত

খরচের ব্যাপার, তাই বুকে-পিঠে অনবরত অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি তখন ঠিক করেছিলাম যে নিজেই আমি বাচ্চাকে খাওয়াব। কিন্তু আমার বাচ্চা সোনামণিটাকে মায়ের দুধের সঙ্গে এত বেশি দুশ্চিন্তা ও ভিতরে পুষে-রাখা উদ্বেগ হজম করতে হচ্ছিল যে তার স্বাস্থ্য সব সময়েই খারাপ যাচ্ছিল এবং দিনরাত্রি অসম্ভব কষ্টভোগ করছিল সে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার পর সে বেচারা পুরো একটা রাত্রিও কোনওদিন ঘুমোয়নি, রাত্রে বড়জোর একটানা দু-তিন ঘন্টা ঘুমোত সে। যে সময়কার কথা বলছি তার অল্প কিছু আগে বাচ্চাটা মাংসপেশির সাংঘাতিক খিঁচুনি-রোগে ভুগছিল এবং সে-সময়ে সর্বদাই তার প্রাণটা ছিল জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে। অসুখের সময় যন্ত্রণার চোটে এত জোরে সে স্তন চুষত যে ঘষা লেগে আমার স্তনের বোঁটা যেত শুকিয়ে আর চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে প্রায়ই তা চুঁইয়ে বাচ্চাটার কাঁপা-কাঁপা কচি ঠোঁট দুটোর মধ্যে চলে যেত। একদিন ওইভাবে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে আমি, এমন সময় আমাদের বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা ঘরে ঢুকল। তার আগের শীতকালে ওকে আমরা ২৫০ Reichstalers দিয়েছিলাম এবং তখন ওর সঙ্গে এই মর্মে একটা চুক্তিও হয়েছিল যে ভবিষ্যতে বাড়িভাড়ার টাকা ওর হাতে না দিয়ে খোদ বাড়িওয়ালার হাতে দেব, কারণ বাড়িওয়ালা ওর বিরুদ্ধেই বেলিফের পরোয়ানা জারি করিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়িকা কিন্তু সেদিন সরাসরি ওই চুক্তির কথা অস্বীকার করে বসল এবং তখনই তার পাওনা পাঁচ পাউন্ড মিটিয়ে দেবার দাবি জানাল। ওই সময়ে অত টাকা হাতে না থাকায় জনা দুই বেলিফ এসে গেল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে আমার সামান্য যা কিছু ছিল সেই চাদর বিছানা জামাকাপড় সমস্তই, এমনকী আমার কোলের বাচ্চাটার দোলনা ও মেয়েদের ভাল ভাল পুতুল পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে আটক করে রাখল আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল মেয়েরা। লোকগুলো এই বলে শাসাল যে দুই ঘন্টার মধ্যে সবকিছু ওরা উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তার মানে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বাচ্চাদের নিয়ে আর বুকের যন্ত্রণা নিয়ে খালি মেঝেয় শুতে হবে আমাকে। ...আমার বাচ্চাদের তখন ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেছে, আর তাদের জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছি আমি। ...”

“...এদিকে আমি তাড়াতাড়ি সমস্ত বিছানাপত্র বিক্রি করে ওষুধের দোকানি, রুটিওয়ালা, মাংস-বিক্রিওয়ালা ও গোয়ালাদের সব পাওনা মিটিয়ে দিলাম। কারণ, বেলিফরা আমাদের জিনিসপত্র ক্রোক করায় এইসব পাওনাদারও ভয় পেয়ে গিয়ে তাদের বিল এনে আমাকে হয়রান করতে শুরু করেছিল। বিছানাগুলো আমরা বিক্রি করে দেওয়ার পর সেগুলো তুলে নিয়ে

একটা ঠেলাগড়িতে বোঝাই করা হতে লাগল। ফলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল বলি শুনুন। তখন সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল। অতএব, সাব্যস্ত হল আমরা ব্রিটিশ আইন ভঙ্গ করছি। বাড়িওয়ালা জনা দুই কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে ছুটে এল। তার বক্তব্য ছিল এই যে ওই বিছানা ইত্যাদির মধ্যে আরও কিছু জিনিস থাকা সম্ভব যা আমরা বিদেশে পাচার করার চেষ্টা করছি। ব্যাস, আর কী চাই! মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দুই থেকে তিন শো লোক গোটা চেলসিয়া পাড়ার যত রাস্তার লোক— সবাই জুটে গেল আমাদের দরজার সামনে। বিছানাগুলো আবার ঘরে ফিরিয়ে আনা হল, কারণ পরের দিনের সূর্যোদয়ের আগে সেগুলো ক্রেতাকে দেওয়া যাবে না, তাই। যা কিছু জিনিসপত্তর ছিল সব বিক্রি করার পর তবে আমাদের ধারদেনা একেবারে পাই-পয়সাটি অবধি মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। অবশেষে আমার কচিকাঁচা বুকের ধনগুলোকে নিয়ে ছোট্ট দুখানা ঘরে এসে উঠলাম।"

"...প্রিয় বন্ধু, আমাদের এখানকার জীবনের একটা দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লম্বা চওড়া গল্প ফেঁদে এত কথা বললুম বলে ক্ষমা করবেন। আমি জানি, এটা অসমীচীন। কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, হাতের কলম ঠিকমতো চলছে না, অন্তত একবারের জন্যেও আজ আমার সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে ভাল আর খাঁটি বন্ধুর কাছে সবকথা বলে মনটা হালকা করা দরকার বোধ করছি। মনে করবেন না এইসব তুচ্ছ ছোটখাটো দুঃখ দুর্দশা, ভাবনাচিন্তা আমার মনোবল নষ্ট করে দিয়েছে। আমি খুব ভাল করেই জানি যে, আমাদের সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন কোনও ব্যাপার নয় এবং বিশেষ করে আমি হলাম সেই বাছাই করা, সুখী, ভাগ্যবতীদের একজন, কারণ আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন আমার স্বামী এখনও আমার পাশে আছেন। সত্যিসত্যি যা আমার আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং হৃদয়কে রক্তাক্ত করছে তা হল এই চিন্তা যে, ছোটখাট ব্যাপারের জন্যে আমার স্বামীকে কতই না কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে, আমার পক্ষে কত সামান্য পরিমাণেই না তাঁর সাহায্যে আসা সম্ভব হচ্ছে এবং যিনি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অসংখ্য লোকের উপকারে এসেছেন তিনি নিজে কত না অসহায়। কিন্তু তাই বলে, প্রিয় হের ভাইডেমায়ার, ভুলেও এ কথা ভাববেন না যে আমরা কারও কৃপাপ্রার্থী। যাঁদের আমার স্বামী তাঁর মতাদর্শ, ভাবনাচিন্তার শরিক করেছেন, উৎসাহ ও সমর্থন জুগিয়েছেন, তাঁদের কাছে একটি মাত্র বস্তুই তাঁর কাম্য আর তা হল কাজকর্মে আরও বেশি প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করা ও তাঁর Revue-কে আরও বেশি করে সমর্থন জানানো। তাঁর হয়ে এটুকু দাবি করার মতো অহঙ্কার ও অধিকার আমার

আছে। এই সামান্য একটুখানি নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য। এটুকু দাবি করলে কারও প্রতি অবিচার করা হবে বলে আমি মনে করি না। আমার দুঃখ শুধু এই-ই। আমার স্বামী কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। কখনও, এমনকী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলোতেও, তিনি ভবিষ্যতে আস্থা হারাননি, এমনকী তাঁর মনোরম রসিকতার বোধও হারাননি। আমাকে হাসিখুশি থাকতে দেখলে এবং আমাদের নয়নের নিধি সন্তানদের তাদের মায়ের কোল ঘেঁষে থাকতে দেখলেই তিনি খুশি থাকতেন।”[৩৭]

লেনিনের লেখা ও জেনি মার্কসের চিঠি শুনে আপনারা নিশ্চয়ই গভীর ব্যথায় অনুভব করছেন, কী দুঃসহ দারিদ্র ও অনাহার-বিনা চিকিৎসায় পর পর সন্তানদের মৃত্যুজনিত অসহ বেদনা কার্ল মার্কসের জীবনে এসেছে। কিন্তু এইসব মর্মান্তিক সংকট শোষণমুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত এই মনীষীর অক্লান্ত সাধনাকে এতটুকু ব্যাহত করতে পারেনি, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। নিজেকে তিল তিল ক্ষয় করে মানবজাতিকে দিয়ে গেছেন অগ্রগতির নতুন পথের সন্ধান, যা যুগ যুগ ধরে সমাজ পরিবর্তনের পথকে আলোকিত করে যাবে।

আজকের এই আলোচনা আমি শেষ করছি ঐতিহাসিক ‘ম্যানিফেস্টো অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি’-তে বিশ্ববিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে মহান মার্কস-এঙ্গেলস যে উক্তি করেছিলেন, সেটা দিয়ে। তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, ‘‘The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win.’’ অর্থাৎ, সর্বহারাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই। তারাই বিশ্বজয় করবে।

তথ্যসূত্র :

১. অদ্বৈত বেদান্ত, দ্য সায়েন্টিফিক রিলিজিয়ন— স্বামী বিবেকানন্দ
২. ক্রিটিক অফ হেগেল’স্ ফিলোজফি অফ রাইট— কার্ল মার্কস
৩. অন দি হিস্ট্রি অব আর্লি ক্রিশ্চিয়ানিটি— ফ্রিডরিক এঙ্গেলস্
৪. মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক (নির্বাচিত রচনাবলী, ২য়

খণ্ড)— শিবদাস ঘোষ

৫. লুউউইগ ফুয়েরবাক অ্যান্ড দ্য এন্ড অব ক্ল্যাসিক্যাল জার্মান ফিলোজফি— ফ্রিডরিক এঙ্গেলস্

৬. অন দি হিস্ট্রি অফ আর্লি ক্রিশ্চিয়ানিটি— ফ্রিডরিক এঙ্গেলস্

৭. ক্যাপিটাল (জার্মান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট)— কার্ল মার্কস

৮. থিসিস অন ফুয়েরবাক— কার্ল মার্কস

৯. মার্কস এঙ্গেলস্ কালেক্টেড ওয়ার্কস— খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা ৪২৯

১০. এ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি (মুখবন্ধ)— কার্ল মার্কস

১১. ডায়ালেক্টিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম— জে.ভি. স্ট্যালিন

১২. এ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি (মুখবন্ধ)— কার্ল মার্কস

১৩. ঐ

১৪. ঐ

১৫. ম্যানিফেস্টো অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি, জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ— ফ্রিডরিক এঙ্গেলস্

১৬. থিসিস অন ফুয়েরবাক— কার্ল মার্কস

১৭. ঐ

১৮. ঐ

১৯. ঐ

২০. লুউউইগ ফুয়েরবাক অ্যান্ড দ্য এন্ড অফ ক্ল্যাসিক্যাল জার্মান ফিলোজফি (উদ্ধৃত)— ফ্রিডরিক এঙ্গেলস্

২১. থিসিস অন ফুয়েরবাক— কার্ল মার্কস

২২. লুউউইগ ফুয়েরবাক অ্যান্ড দ্য এন্ড অফ ক্ল্যাসিক্যাল জার্মান ফিলোজফি (উদ্ধৃত)— ফ্রিডরিক এঙ্গেলস্

২৩. ঐ

২৪. ঐ

২৫. থিসিস অন ফুয়েরবাক— কার্ল মার্কস

২৬. লুউউইগ ফুয়েরবাক অ্যান্ড দ্য এন্ড অফ ক্ল্যাসিক্যাল জার্মান ফিলোজফি— ফ্রিডরিক এঙ্গেলস্

২৭. মহান মার্কসের সমাধিস্থলে এঙ্গেলসের শ্রদ্ধার্ঘ্য

২৮. ফ্রিডরিক এঙ্গেলস্— ভ.ই. লেনিন

২৯. আওয়ার প্রোগ্রাম, আর্টিকেলস্ ফর রাবোচায়া গেজেটা— ভ.ই. লেনিন

৩০. ফাউন্ডেশন অফ লেনিনিজম্— জে. ভি. স্ট্যালিন

৩১. ক্রিটিক অফ দ্য গোথা প্রোগ্রাম— কার্ল মার্কস
৩২. ঐ
৩৩. ঐ
৩৪. কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নতুন জার্মান সংস্করণের শেষ মুখবন্ধ— মার্কস-এঙ্গেলস্
৩৫. কার্ল মার্কস, এ ব্রিফ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ উইথ অ্যান এক্সোপোজিশন অফ মার্কসিজম— ভ.ই.লেনিন
৩৬. এ শর্ট স্কেচেস্ অফ অ্যান ইভেন্টফুল লাইফ— জেনি মার্কস
৩৭. লেটার টু জোসেফ ওয়েডেমেয়ার ইন ফ্রাঙ্কফুর্ট, ২০ মে ১৮৫০— জেনি মার্কস